إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI
Fortnightly

প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে ?
সে-ই, যে বিশ্বাস করে যে,
আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ)
তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে
যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে
তাঁহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন
রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য
আর কোন গ্রন্থ নাই ।

-হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪৫বর্ষ ।। ৭ম সংখ্যা
৫ই রবিউসসানী, ১৪১২ হিঃ ।। ২৯শে আশ্বিন, ১৩৯৮ বাংলা ।। ১৫ই অক্টোবর, ১৯৯১ইং
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৪৮'০০ টাকা ।। ভারত ৮৫'০০ টাকা। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ৭ম সংখ্যা পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফঃ নম্রতা

অনুবাদক : মাওলানা সালেহ্ আহ্‌মদ, সদর মুরব্বী ৩

অমৃত বাণীঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

অনুবাদক : মাওলানা ফিরোজ আলম, সদর মুরব্বী ৪

জুমুআর খুৎবাঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদক : মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী ৬

কবিতাঃ চলো শান্তির পায়রা উড়াই

জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর ২৪

জেহাদ বিল্ কুরআন

জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান ২৫

একটি সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ৩১

সংবাদ ৩৪

সম্পাদকীয়

কাফের বানানোর পাঁয়তারা

রবিউল আউয়াল মাস আসলে প্রতিটি মোমেনের হৃদয়ে আনন্দের বান ডাকে। এ মাসে আমাদের প্রাণ-প্রিয় নবী, বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন আর্ত নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানবতাকে পথ নির্দেশনার মাধ্যমে এক সুউচ্চ মাকামে প্রতিষ্ঠা-কল্পে। তাই, এ মাস ভর সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ মহানবী (সাঃ)-এর জীবনাদর্শকে আর একবার দৃষ্টিপটে এনে, তা নিজেদের জীবনে অবলম্বন করার প্রয়াস পায়। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, এ মাসেরই পবিত্র দিনগুলোতে একদল আলেম নামধারী ব্যক্তিত্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তকে অমুসলিম তথা কাফের ঘোষণা করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর কোনও সাহাবী এমন কোনও ব্যক্তিকে কখনও কি অমুসলিম ঘোষণা করেছিলেন, যে কলেমা পাঠ করত ও নিজেকে মুসলমান বলত? অতএব, এরূপ গর্হিত কাজ কি মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শের বিপরীত কাজ নয়? তিনি (সাঃ) এসেছিলেন সারা বিশ্বকে মুসলিম বানাতে। আর আজকের আলেমরা মুসলিমকে বানাতে চান কাফের। কী বিপরীত ভূমিকা! অথচ তারাই ধর্মের ধ্বজধারী। সারা বিশ্বের লক্ষ

(অবশিষ্টাংশ ৩৯ পাতায় দেখুন)

পাঠক পাঠিকাগণ দৃষ্টি দিন!

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র 'পাক্ষিক আহ্‌মদী'। এর অংগ সৌষ্ঠব ও মানগত গুণ সংরক্ষণ ও উন্নতি অনেকাংশে আপনার সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। আশা করি আপনি আপনার দায়িত্ব উপলব্ধি করতঃ নিম্নলিখিত তথ্য বিবরণী পূরণ করে সত্বর নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন:

(১) আপনি রীতিমত পত্রিকাখানা পাঠ করেন কি? হাঁ/না

(২) আপনি কি পত্রিকার সৌজন্য কপি পান? হাঁ/না

(৩) আপনার ঠিকানা ঠিক আছে কি? না থাকলে সঠিক ঠিকানা অবহিত করুন।

(৪) আপনি বর্তমান (১৯৯১-৯২) বছরের চাঁদা দিয়েছেন কি? যদি দিয়ে থাকুন তবে রশিদ নং.....তারিখ.....

(৫) যদি বর্তমান বছরের চাঁদা (৪৮/-) না দিয়ে থাকেন তবে এখন পাঠান এবং মনিঅর্ডার নং.....তারিখ.....পোষ্ট অফিসের নাম... উল্লেখ করুন।

(৬) অনিবার্য কারণে এখনও আমরা আপনার বকেয়া চাঁদার হিসাব তৈরী করতে পারিনি। বকেয়া নির্ধারিত হলে আপনি তা দিতে বাধ্য থাকবেন।

(৭) আপনার নিকট থেকে উপরোক্ত তথ্য বিবরণী না পাওয়া গেলে আমরা বুঝব যে, আপনি 'পাক্ষিক আহ্‌মদী' পাঠে অনিচ্ছুক। তাই জানুয়ারী '৯২ থেকে আপনার নামে পত্রিকা পাঠানো হবে না।

পাক্ষিক আহ্‌মদী ব্যবস্থাপনা
৪নং বকশীবাজার রোড,
ঢাকা—১২১১
ফোন :—৫০১৩৭৯

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৫তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

১৫ই অক্টোবর, ১৯৯১ইং : ১৫ই ইখা, ১৩৭০ হিঃ শামসী : ২৯শে আশ্বিন, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর

সূরা আল্‌-বাকারা-২

১৯১। এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধ (২১৯) কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

১৯২। এবং যেখানেই তোমরা তাহাদিগকে (অন্যায়ভাবে যুদ্ধকারীদিগকে)-(২২০) পাইবে হত্যা করিবে এবং তোমরাও তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া দিবে যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বাহির (২২১) করিয়াছে, কেননা ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। এবং তোমরা মসজিদুল হারামের (মধ্যে এবং উহার) নিকটে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না যে পর্যন্ত না তাহারা উহাতে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। ইহাই কাফেরদের সমুচিত প্রতিফল।

২১৯। এই আয়াতটি প্রাথমিক কালের আয়াতগুলির মধ্যে একটি, যেগুলিতে মুসলমানদিগকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। এই অনুমতি সম্বলিত প্রথম আয়াত হইল ২২ : ৪০। আলোচ্য আয়াতে ধর্ম-যুদ্ধের নিয়মাবলী ও শর্তসমূহের সারাংশ বিধৃত হইয়াছে, যথা: (ক) এরূপ যুদ্ধ কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র পথে সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন দূরী করণের উদ্দেশ্যে হইতে হইবে অর্থাৎ ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম-কর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য হইতে হইবে, (খ) যাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রথমে অস্ত্র ধারণ করে, কেবল তাহাদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করা যাইতে পারে, (গ) শত্রুরা যুদ্ধ থামাইয়া দিলে, মুসলমানকে সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র সংবরণ করিতে হইবে।

২২০। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং চলিতেছে, এই আয়াতটি সেই সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই আয়াত মুসলমানকে ঐসব অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বলিতেছে, যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে আগে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

১৯৩। অতঃপর, তাহারা যদি বিরত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

১৯৪। এবং তোমরা তাহাদের সহিত ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিৎনা দূরীভূত করা হয় এবং দীন আল্লাহ্‌রই (২২২) জন্য (কায়েম) হয়। অতঃপর, যদি তাহারা নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে (জানিও যে) কাহারও বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা (২২৩) নাই কেবল অত্যাচারী ব্যতিরেকে।

২২১। 'তোমরাও তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া দিবে যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বাহির করিয়াছে' এই বাক্য মক্কা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। মক্কা ইসলামের সর্বাধিক পবিত্র স্থান ও মুসলমানদের কেন্দ্রভূমি। অতএব, যুদ্ধে লিপ্ত কোন অমুসলমানকে এখানে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে।

২২২। এই আয়াতটিও প্রমাণ করে যে, মুসলমানকে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবার অনুমতি কেবল তখনই দেওয়া হইয়াছে, যখন বিরোধী শক্তি তাহাদের উপর যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছে। অনুমতি দিবার সাথে সাথে ইহাও বলা হইয়াছে, যুদ্ধ আরম্ভ করিলে ঐ সময় পর্যন্ত চালাইয়া যাও যে পর্যন্ত ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না হয়। ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যুদ্ধ থামাইয়া দাও। হযরত রসূল করীম (সাঃ) অবিশ্বাসীদের সাথে অনেকগুলি শান্তি-সন্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ ইহাই হইত যে, ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ চালাইয়া যাও, তাহা হইলে মহানবী (সাঃ) ঐ সব সন্ধি কখনও সম্পাদন করিতেন না।

২২৩। 'উদওয়ান' অর্থ ঃ (১) শত্রুতা, (২) অন্যায় আচরণ, (৩) অন্যায় আচরণের শাস্তি এবং (৪) কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার জন্য তাহার কাছে যাওয়া (মুফ-রাদাত, লেইন) ১৯১ নং আয়াত হইতে ১৯৪ নং আয়াত পর্যন্ত চারিটি আয়াত যুদ্ধের নিম্নলিখিত নিয়ম-কানুন নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে ঃ- (ক) যুদ্ধ কেবল মাত্র আল্লাহতা'লার খাতিরেই করা যাইতে পারে ; আত্ম-স্বার্থ, ক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধি, জাতীয় স্বার্থের সম্প্রসারণ ইত্যাদি কারণে নহে, (খ) আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার জন্যই কেবল মুসলমানেরা যুদ্ধ করিতে পারে, নিজেরা প্রথম আক্রমণকারী হইতে পারে না, (গ) আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার জন্যই কেবল মুসলমানেরা যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ রাখিতে আদিষ্ট হইয়াছে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র (অর্থাৎ শত্রুরা পরাজিত কিংবা সন্ধিবদ্ধ কিংবা প্রতিহত হওয়া মাত্র) যুদ্ধ বন্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়াছে, (ঘ) তাহারা কেবল শত্রু পক্ষের যোদ্ধাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করিবে কিন্তু বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে আক্রমণ কিংবা অপমান করিতে পারিবে না, (ঙ) যুদ্ধ চলা-কালীন সময়েও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে কোন বাধা সৃষ্টি করা যাইবে না, (চ) ধর্মীয় তীর্থ স্থান আক্রমণ করা কিংবা ঐগুলির কোন রূপ ক্ষতি সাধন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এমনকি ঐ স্থানের আশে পাশে যুদ্ধ করাও নিষিদ্ধ, (ছ) যদি শত্রুরা তাহাদের ধর্মীয় স্থানে অবস্থান নিয়া আক্রমণ চালায়, কেবল মাত্র তখনই মুসলমানেরা সেখানে যুদ্ধ করিতে পারিবে এবং (জ) যুদ্ধ ততক্ষণই চালাইয়া যাইবার অনুমতি আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে জবরদস্তি ও হস্তক্ষেপ বন্ধ না হইবে। ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠামাত্র যুদ্ধ থামাইতে হইবে (দেখুন ৮:৪০ ৯:৪-৬, ২২:৪০-৪১ ইত্যাদি)।

হাদিস শরীফ

নম্রতা

অনুবাদক : মাওলানা সালেহ্ আহমদ,
সদর মুরব্বী

কুরআন :

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
(ال عمران ١٦٠)

অর্থাৎ : যদি তুমি রুক্ষ এবং কঠোর চিত্ত হতে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার চারদিক হতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তো। (সূরা আলে ইমরান-১৬০)

হাদীস :

عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله رفيق يحب الرفق
(متفق عليه)

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্তা'লা নম্র এবং নম্রতাকে পসন্দ করেন। (মুত্তাফেক আলায়হে)

ব্যাখ্যা :

মানুষের উন্নতির জন্য নম্রভাষী হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। জগতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে হলে নম্রতাকে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। নম্রতা মানব হৃদয়ে স্থায়ী প্রভাবের সৃষ্টি করে, যদ্দরুণ নম্রভাষী ও নম্র স্বভাবের ব্যক্তিবর্গ অমর হয়ে থাকেন। হযরত রসূল করীম (সাঃ)-কে পাষাণ হৃদয়ের ব্যক্তিদের জন্যে প্রেম ও ভালবাসার প্রতীক বানিয়ে দেয়া তাঁর নম্রতার কারণেই হয়েছিল, যার কথা কুরআন উল্লেখ করেছে।

প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন, খোদাতা'লা নম্রতাকে পসন্দ করেন তোমরা নম্রতাকে নিজেদের পাথেয় বানাও। নম্রতা কোমল হৃদয়ের পরিচয় বহন করে। সুতরাং আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের পরিচয় এই গুণ দ্বারাও পাওয়া যায়। কুরআন বলেছে, আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্তদের পরিচয় এই যে, رحماء بينهم তারা পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত করুণা ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখেন। হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, উত্তম ভাবে সাক্ষাৎ করা আর নম্র ভাবে কথা বলাও একটি সদকা।

নম্রতা শত্রুকেও ভাই বানিয়ে দেয় কারণ ইহা এমন এক নেকী ও বৈশিষ্ট্য যা খোদার নিকট প্রিয়। আজ এই পৃথিবীতে এতো হানাহানি মারামারি এর একটি কারণও ইহা যে, নম্রতা বিসর্জন দিয়ে দেয়া হয়েছে। মনে করা হয়, শক্তি ও কঠোরতা দ্বারা হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করা যায়। ইহা শুধু ধারণা মাত্র। শক্তি ও কঠোরতা দ্বারা শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা যেতে পারে হৃদয়ের উপর নয়। তাই ইসলামের শিক্ষা এই যে, তোমরা শান্তিকে প্রসারতা দান কর। কোমল হৃদয়ের অধিকারী হও এবং নম্রতাকে অবলম্বন কর যাতে করে বিশ্বে স্থায়ী ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং ইসলাম এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানবের হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। খোদাতা'লা আমাদিগকে হাদীসে রসূল (সাঃ) অনুযায়ী নম্রতাকে নিজেদের ভূষণ বানানোর তৌফিক দান করুন। আমীন

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক : মাওলানা ফিরোজ আলম
সদর মুরব্বী

১৮৯১ খৃষ্টাব্দ

হযরত আবদুল করীম সাহেব (রাঃ) বলেন,

আগমনের উদ্দেশ্য ঃ

"আমার ভাল স্মরণ আছে আর আমি নিজের নোট বইতে ইহাকে লিখে রেখেছি যে, জলন্ধরে এক ব্যক্তি সত্যিকার ইমাম হযরত মির্যা সাহেবের নিকট প্রশ্ন করলো, 'আপনার পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য কি' ?.....

হুযূর (আঃ) বললেন, 'আমি এই জন্যে এসেছি যেন মানুষ ঈমানী শক্তিতে উন্নতি লাভ করে।'

ঈমান দুই প্রকারের ঃ

আরও একটা কথাও আমার নোট বইতে লেখা রয়েছে আর তাও জলন্ধরের ঘটনা। আমাদের জামা'তের এক ব্যক্তি আমাদের ভাই মুন্‌সী মুহাম্মদ অরুড়া সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'হুযূর ঈমান কয় ধরণের হয়ে থাকে ?' তিনি ইহার যে উত্তর প্রদান করেন তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সহজ।

তিনি বললেন, 'ঈমান দু'ধরণের হয়, মোটা এবং সূক্ষ্ম। মোটা ঈমান হলো বাধ্যতামূলক ভাবে ধর্মীয় বিষয়ে আমল করা, আর সূক্ষ্ম ঈমান হলো আমার অনুসারী হওয়া'।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ

জনাব মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব লিখেন, ১৮৯৫ সালে যখন আমি হযরত আকদাসের কাছে উপস্থিত হতাম সে সময়েও তাঁর মলফুযাত (অমৃত বাণী) একটা কাগজে লিখে লাহোরে নিয়ে সেখানকার আহ্‌মদী বন্ধুদের সাপ্তাহিক মিটিংএ শুনানোর স্পৃহা ছিল। সে সময়কার স্মৃতি পটের কিছু কথা লিখে পাঠকদের সমীপে দেয়া হচ্ছে — সে সময় যেহেতু তারিখ সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা ছিল না সেজন্য তারিখবিহীনভাবে প্রত্যেক কথা লিখা হচ্ছে—

বয়আত এবং তওবা আর এতদসংশ্লিষ্ট গুনাহ্‌র অবস্থাদি ঃ

বয়আত করে কি লাভ আর এর আবশ্যকতা কি তা জানা উচিত। যখন পর্যন্ত কোন বস্তুর উপকারিতা এবং মূল্য জানা না থাকে ততক্ষণ তার মূল্য চোখে ধরা পড়ে না। যেমন ঘরে

মানুষের কয়েক প্রকারের সম্পদ ও বস্তু থাকে, যেমন টাকা, পয়সা, কড়ি, লাকড়ি, ইত্যাদি। সেজন্য বস্তু যে পর্যায়ের হবে তার রক্ষণাবেক্ষণও অনুরূপ হবে। একটা কড়ির রক্ষণাবেক্ষণের অনুরূপ ব্যবস্থা কেউ করবে না যা তাকে পয়সা ও টাকার জন্য করতে হবে। অধিকন্তু লাকড়ি ইত্যাদিকে তো এমনিতেই এক কোণাতে ফেলে রাখবে। এই পরিমাপ অনুসারে যা হারালে তার বেশী ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা সে বেশী যত্নের সাথে তা রক্ষণাবেক্ষণ করবে। অনুরূপ ভাবে বয়াতের মহান দিক হলো 'তওবা' যার অর্থ হলো 'ফিরে আসা'। তওবা এই অবস্থার নাম যে, মানুষ স্বীয় পাপ থেকে, যার সাথে তার অতিরিক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং সেগুলোকেই সে তার স্বদেশ হিসেবে বেছে নিয়েছে, বরং সে পাপের মধ্যেই জীবন যাপনের পন্থা খুঁজে পেয়েছে তওবার অর্থ হলো সেই দেশকে ত্যাগ করা আর প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হলো, পবিত্রতা অবলম্বন করা। দেশকে ছাড়া তো বড় কঠিন এবং অনেক কষ্টদায়ক হয়। একটি ঘর যখন মানুষ পরিবর্তন করে তখন মানুষের কত কষ্ট হয় আর দেশ ত্যাগ করার সময় তো তাকে সকল বন্ধু-বান্ধবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়, এবং সব জিনিষ যেমন চৌকি, বিছানা, প্রতি বেশী, অলিগলি, বাজার সকল কিছু ছেড়ে একটা নতুন দেশে যেতে হয় অর্থাৎ পূর্বের দেশে সে কখনও ফিরে আসে না ইহার নাম হলো তওবা। পাপের সাথী এক রকম হয় আর তাকওয়ার বন্ধু অন্য রকম। এই পরিবর্তনকে সুফীরা মৃত্যু আখ্যা দিয়েছেন। যে তওবা করে তাকে বড় কষ্ট সইতে হয় আর সত্যিকার তওবার সময় সে বড় বড় বাধার সম্মুখীন হয়। আল্লাহ্‌তা'লা বড় দয়ালু ও কৃপাবান তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সকল কিছুর পাল্টা প্রতিদান দিয়ে থাকে, ততক্ষণ তাকে মারেন না। إن الله يحب التوابين (بقرة ٢٢٣) তে ইহাই ইশারা রয়েছে যে, যে তওবা করে সে দরিদ্র ও অসহায় হয়ে যায়। সে জন্য আল্লাহ্‌তা'লা তাকে ভালবাসেন ও স্নেহ করেন এবং তাঁকে পুণ্যবানদের জামা'তভুক্ত করেন। অন্যান্য জাতিরা খোদাকে দয়ালু ও কৃপাবান হিসেবে মানে না। খৃষ্টানেরা খোদাকে অত্যাচারী এবং ছেলেকে দয়ালু গণ্য করেছে যেন পিতা তো পাপ ক্ষমা করেনি কিন্তু পুত্র প্রাণ উৎসর্গ করে তা ক্ষমা করান। পিতা পুত্রের মাঝে এত বড় বিভেদ করা বড়ই বোকামী। পিতা ও সন্তানের মধ্যে চরিত্র ও অভ্যেসের মিল থাকে (কিন্তু এখানে মোটেও নেই)। যদি আল্লাহ্‌ দয়ালু না হতেন তাহলে মানুষ মোটেই চলতে পারতো না। যিনি মানুষের কর্মের পূর্বেই হাজার হাজার বস্তু তার উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে কি এ ধারণা করা যায় যে, তিনি তওবা ও কর্মকে গ্রহণ করবেন না?'

(মলফুযাত: ১ম খণ্ড, পৃ: ১ ও ২)

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।"

(আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

জুমু'আর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৩০শে আগষ্ট, ১৯৯১ইং তারিখে জার্মানীতে প্রদত্ত]

অনুবাদক : মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী
সদর মুরব্বী

তাশাহুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (আইঃ) বলেন : গত খুতবায় আমি একটি নতুন বিষয়ে আলোকপাত আরম্ভ করেছি যার সম্পর্ক তাক্ওয়ার সাথে। আমি বলেছিলাম যে, অনেক সময় তাক্ওয়ার অভাবে বা নিজের অবস্থা সম্বন্ধে অনবহিত হওয়ার কারণে (এই দু'টি প্রকৃতপক্ষে একই রোগ) মানুষ এমন ভুল করে বসে এবং তা অনবরত করতে থাকে যার কারণে সে নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হয় আর যদি এই ভুল জামা'তী ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত হয় তবে সে অনেক মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত অরাজকতা ও ফিৎনা লালিত হয় এবং সময় সময় তা মাথা চারা দিয়ে উঠে। ব্যক্তিগত অপরাধের সম্পর্ক আল্লাহ্ ও অপরাধী বান্দার মাঝে সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন তার গুরুত্ব জামা'তী (তথা সামাজিক) অপরাধের সমান হতে পারে না, কেননা জামাতী ভুলের কারণে 'নিযাম' (ব্যবস্থাপনা) ধ্বংস হয় আর পরবর্তীতে কয়েকটি ভবিষ্যত প্রজন্মের ক্ষতির কারণ হয়। জামা'তী অপরাধের ফলশ্রুতিতে কেবল একটি প্রাণই ডুবে না বরং সে হাজার-হাজার লাখ-লাখ এমনকি কখনো কখনো কোটী কোটী মানুষকে সাথে নিয়ে ডুবে। বিগত কিছু সময় ধরে আমি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছি যে, কোন জায়গায় ফিৎনা মাথা চারা দিয়ে উঠার আগেই তাকে নির্মূল করেছি এবং এই কার্যকলাপ আমার এবং সংশ্লিষ্ট জামা'তের মধ্যে চিঠি পত্রের আকারে সীমাবদ্ধ ছিল। আমি মনে করি, এখন এসব বিষয়াদি সমগ্র জামা'তের জানা উচিত। জামা'ত যেন জানতে পারে যে, ফিৎনা কাকে বলে, কি ভাবে তা লালিত হয় এবং মাথা চারা দেয় আর কিভাবে কখনো কখনো বাহ্যতঃ বুযুর্গ ও মুত্তাকী ব্যক্তিরা নিজেদের আত্মার ধোকায় পড়ে সমস্ত জামা'তের জন্যে একটি পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ান বরং শয়তানের জন্যে এক ধরণের যন্ত্র-কৌশল হয়ে যান। কিছু কিছু লোক ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরণের শয়তানী করে থাকে। আল্লাহ্র ফযলে আমাদের জামা'তে এ ধরণের লোক নেই বল্লেই চলে। কিন্তু এমন কিছু লোক রয়েছে যারা নিজেদের বোকামীর কারণে নিজেদের দুর্বলতা না দেখার কারণে, তাক্ওয়ার অভাবে এ ধরণের অপরাধ সংঘটিত করে থাকেন এবং আমার জন্যে জামা'তী বিষয়ে একটি স্থায়ী সমস্যা সৃষ্টি করে থাকেন।

আজকের খুতবায় জার্মানীর আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্বন্ধে কিছু কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যা আপনাদের বেশীর ভাগ সদস্য অবহিত নন। এক দীর্ঘ সময় ধরে আমি বোধ করছিলাম যে, তাদের জাতীয় মজলিসে আমেলা স্বীয় আমীরের যথাযথ সম্মান করে না। তার মাঝে এমন সব পঞ্চভূত রয়েছে যা একে অপরকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে, একে অপরকে অপমান করতে সচেষ্ট এবং মজলিসে আমীরের মর্যাদার খেয়াল না রেখে আপসে এমন সব লাগামহীন কথাবার্তা বলা হয় যা নিঃসন্দেহে বেআদবীর শামিল। যদি এমন কোন ব্যক্তি কোথাও উপবিষ্ট থাকেন যিনি সম্মানিত ও মর্যাদাবান, সেই সাথে যিনি জামা'তী নিযামের প্রতিনিধি তাঁর অনুমতি ছাড়া নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা বলা, একে অপরকে হীন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করা একে অপরের বিরুদ্ধে কুধারণা পোষণ করতঃ মজলিসে আমেলার সম্মান ক্ষুন্ন করা তো দূরে থাক—তাঁর সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলাই বেআদবী। এ ধরণের নালিশ নির্দিষ্ট আকারে আমি পাইনি বটে কিন্তু আমীর সাহেবকে আমি যখন জিজ্ঞেস করতাম তখন তিনি, যেহেতু অত্যন্ত ধৈর্যশীল সরল ভদ্র ও নালিশ করতে অনভ্যস্ত অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতেন, মনে হয় আমি অনভিজ্ঞ আমার না জানার কারণেই হয়ত আমি মজলিসে আমেলাকে সামলাতে পারি না এবং এ ধরণের অঘটন ঘটে যায়। তদনুযায়ী বিগত কয়েক বছরের মধ্যে কমপক্ষে দু'বার আমি উক্ত মজলিসে আমেলার সাথে বৈঠকে বসি এবং বিস্তারিতভাবে তাদেরকে বুঝাই, কোন্ কাজটি সঠিক এবং কোন্‌টি সঠিক নয় আর কোন্‌টি আপনাদের জন্যে বর্জনীয় আর কি কাজ করণীয় এবং এ সব কাজে আমীর সাহেবের মাকামকে জামা'তে প্রতিষ্ঠা কল্পে আপনাদের কিভাবে সহযোগিতা করতে হবে। কোন্ ধরণের ছোট ছোট জঘন্য বিষয় থেকে বিরত থাকা আবশ্যক যার কারণে জামা'তে ফিৎনা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি মজলিসে আমেলাই খণ্ড-বিখণ্ড এবং অনৈক্যের প্রতিভূ হয় তাহলে বাকী জামা'তের তরবীয়ত কিভাবে সম্ভব? কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, এসব কথার বিশেষ কোন প্রভাব মজলিসে আমেলার কিছু সদস্যের উপর পড়ে নি। এখনও আমি কঠোর হাতে এই ফিৎনার মূলোচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নেই নি কেননা তাদের প্রত্যেক সদস্য নিজের স্থানে উত্তম সেবক এবং জামা'তের সাথে বাহ্যতঃ তাদেরকে নিষ্ঠা ও ত্যাগের সম্পর্কযুক্ত মনে হচ্ছিল। তাদের প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবছিল যে, সে ছাড়া অন্য সবই দোষখী। তাদের সামনে পুরো ব্যাপারটি পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই যে, এরপর যদি এরূপ কোন নড়চড় হয় তাহলে আগামীতে কেবল নসিহতের মাধ্যমে পদক্ষেপ নেয়া হবে না বরং আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যে কোন মূল্যে আমি সেই দায়িত্ব পালন করব। এবার নতুনভাবে ফিৎনা ধরা পড়েছে। জার্মানীর আমীর সাহেব যখন (ইংল্যাণ্ডের) বার্ষিক জলসায় আসেন তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, কেমন আছেন? আপনার 'আমারত' (আমীরের কাজকর্ম) কেমন চলছে? এ কথা শুনে আবেগের তাড়নায় তিনি ভেঙ্গে পড়েন। বড় কষ্টে নিজেকে সামলানোর পর তিনি আমাকে জানাতে সক্ষম হন,

'গত কিছুদিন থেকে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে আর আমার মনে হচ্ছিল যেন একটি দল আমার বিপক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গত আমেলার মিটিং-এ (যা জার্মানীর মজলিসে শূরার পর অনুষ্ঠিত হয়) আমার নায়েব আমীর ও মুরব্বী ইনচার্জ সাহেব আমাকে ভীষণভাবে অপমানিত করেছেন এবং প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ করতঃ আমার সাথে বেআদবীর আচরণ করেছেন।' এর পটভূমি যেহেতু মজলিসে শূরার (জার্মানীর) কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিল তাই আমি তাঁকে (জার্মানীর আমীর) বললাম, 'আপনি এ বিষয়টি সম্পর্কে আর চিন্তা করবেন না। বিচার করা এখন আমার কাজ। আপনি মজলিসে শূরার অডিও রেকর্ডিং আমাকে পাঠিয়ে দিন যেন কেবল একজনের নালিশের উপর ভিত্তি করে নয় বরং নিজে কার্যধারা শুনার পর নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে পারি এবং সেই সঙ্গে মজলিসে আমেলার কার্য বিবরণী সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট লিখে পাঠান।' আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর আমি উক্ত মুরব্বী ইনচার্জকে তার একটি কপি প্রেরণ করে জিজ্ঞেস করি, 'আমাকে আপনি জানান যে, এই রিপোর্টে আপনার প্রতি আরোপিত অভিযোগগুলোর কোন্ কোন্‌টি সঠিক নয়।' এর উত্তরে তিনি লিখে পাঠান যে, আরোপিত বিষয়াবলী সঠিক কিন্তু সমস্ত বিবরণ পরিবেশিত হয় নি। যদি অনুমতি দেন তবে আপনাকে সেগুলো জানাতে পারি। আমি তাকে বললাম, 'অনুমতি দিচ্ছি, আপনি আমাকে বিস্তারিতভাবে লিখে জানান যে, আমীর সাহেব কি কি বিষয় লিখেন নি যা লিখা তার উচিত ছিল।' অতঃপর রিপোর্টের ঐ অংশটিও আমার হস্তগত হ'ল। এভাবে এই ফিৎনা মাথাচাড়া দিয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে আমাকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে এবং ঐ জামা'তের কতিপয় পুরোনো কর্মীদেরকে জামা'তের সেবা থেকে সরিয়ে দিতে হয়েছে।

কিন্তু এ ছাড়া এর আরও কিছু পটভূমিকা রয়েছে যা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। যখন আমি উক্ত সাবেক মোবাল্লেগ ইনচার্জকে জার্মানীতে বদলী করেছিলাম (যিনি এই বিবাদের হোতা সাব্যস্ত হন) তখন আমি তার পক্ষ থেকে একটি অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক চিঠি পাই যা পড়ে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই। সেই পত্রের সারসংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, কার্যতঃ আমি যেন সব ধরণের ক্ষমতার অধিকারী হই। আমীর সাহেব নিজ স্থানে ঠিক থাকবেন কিন্তু আমার হাতে সব ধরণের ক্ষমতা থাকা চাই। সেই পত্রের সবটা আপনাদের সামনে আমি পরিবেশন করতে পারছি না কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি বাক্য পড়ে শুনাচ্ছি। কেবল জার্মানীর জামা'তের জন্যে নয় বরং সারা পৃথিবীর জামা'তগুলোর উপকারার্থে যেন তারা বুঝতে পারেন যে, কিভাবে 'আমিত্ব' সংগোপনে আত্মপ্রকাশ করে এবং কেমন সব দাবী-দাওয়াতে রূপান্তরিত হয়।

আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বর্তমানে জামা'তের প্রচলিত নিয়মানুসারে একটি ব্যবস্থা রয়েছে যে সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আমীর, নায়েব আমীর ও সদর সাহেবগণ

এবং বিশেষ করে মুরব্বীগণ অবগত আছেন যে, যদি কোন দেশের আমীর মুরব্বী সিলসিলা না হন তবে মুরব্বী সিলসিলাকে সাধারণতঃ নায়েব আমীর বানানো হয়। এটি আবশ্যক নয় তথাপি বানানো যেতে পারে। তদনুযায়ী আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, এই সাহেবকেও (অর্থাৎ উক্ত মুরব্বী ইনচার্জকে) নায়েব আমীর বানানো হবে। তার পরামর্শগুলো এরূপ ছিল: তবলীগি কাজের তদারকি এই অধমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হবে। এটি সম্পাদনকল্পে সব জামা'তগুলোর তবলীগ সেক্রেটারীদের সাথে এই অধমের সরাসরি যোগাযোগ হবে। তরবীয়তি বিভাগও সরাসরি খাকসারের তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত। মজলিসে আমেলায় খাকসারের কোন পদ যথা নায়েব আমীর ইত্যাদি যেন না থাকে বরং মজলিসে আমেলায় খাকসার যেন কেবল মুবাল্লেগ ইনচার্জরূপে থাকে এবং মরকযী প্রতিনিধি হিসেবে খাকসার যেন মজলিসে আমেলার সিদ্ধান্তসমূহ ও তাদের কার্যকলাপের সাধারণভাবে তত্ত্বাবধান করে।" অর্থাৎ মজলিসের সদস্য হয়েও তিনি যেন আমীরের উর্ধ্বে আমার (অর্থাৎ খলীফার) পক্ষ থেকে একজন সরাসরি প্রতিনিধি হয়ে সেখানে সমাসীন হন। তিনি আরও লিখেন: অংগ সংগঠন সমূহের সাথে খাকসারের গভীর সংযোগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সদর সাহেবরা হুযুর আনওয়ারের (আইঃ) সমীপে যে রিপোর্টসমূহ প্রেরণ করেন তার অনুলিপি যেন খাকসারকে প্রেরণ করেন। জামা'তের তবলীগি ও তরবীয়তি কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিকল্পে সে সব তথ্যাদি খাকসারের প্রয়োজন হবে। মোহতরম আমীর সাহেব এবং মজলিসে আমেলার সংশ্লিষ্ট বিভাগের জন্য সে তথ্য সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক হবে। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কেবল আমার নাম আমীর রাখা হবে না কিন্তু কার্যতঃ আমীর এবং মজলিসে আমেলার চেয়ে বড় একটি পদ আমার জন্য যেন সৃষ্টি করা হয় তা না হলে আমি যথাযথভাবে কাজ করতে পারব না।

আমি তাকে এই পত্রের যে উত্তর দিয়েছিলাম তার সারাংশ হচ্ছে এরূপ: "আপনি পশ্চিম জার্মানীর জামা'তের নায়েব আমীর হবেন এবং মজলিসে আমেলায় এটিই আপনার পরিচয়। সব বিষয়ে মোহতরম আমীর সাহেবকে সঠিক পরামর্শ দেয়া আপনার দায়িত্ব হবে এবং আমারাতের মাকাম জামা'তে প্রতিষ্ঠাকল্পে আপনি সহযোগী ও সাহায্যকারী হবেন। যদি তিনি আপনার পরামর্শ গ্রহণ না করেন তবে নিঃসংকোচে আমীরের সামনে আনুগত্যের জন্য মাথা নত করুন। যদি কখনো কোন বিষয়ে আমীরের সিদ্ধান্তকে জামা'তের স্বার্থ-বিরোধী মনে করেন তবে আমীরের মাধ্যমে আপনার ভিন্ন মতামত আমাকে লিখিতভাবে জানান। এছাড়া যত ধরণের ক্ষমতা আমীর সাহেব আপনাকে দিতে চান, নিয়মের সীমার মাঝে থেকে তিনি তা আপনাকে দিতে পারেন। আমীর সাহেব যদি আপনার উপর আস্থা রাখেন তবে তিনি যত ইচ্ছা আপনাকে ক্ষমতা দিবেন, আমি নিজ পক্ষ থেকে কোন দায়িত্ব নির্ধারিত করব না। তা না হলে জামা'তের ব্যবস্থাপনায় অসামঞ্জস্য ও স্ববিরোধিতা সৃষ্টি হয়ে যাবে।" এ ছাড়া আরও অনেক কথা তাকে আমি বুঝাই এবং পরিশেষে লিখি, "উপরে উল্লেখিত বিষয়াদি সম্বন্ধে আমার এই সুধারণা ছিল যে, আপনি ঐগুলো আগের

থেকেই জানেন। কিন্তু আপনার দীর্ঘ দাবী-দাওয়া আমার সুধারণার উপর আঘাত হেনেছে।" অন্য আরেক স্থলে আমি তাকে জানাই, আমি ফিৎনার গন্ধ পাচ্ছি, আপনি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করুন এবং আমীরের পূর্ণ আনুগত্য করুন তা না হলে আপনি ধর্ম-সেবায় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন।" আবার আর একটি ইংরেজী পত্রে আমি তাকে লিখি, "আমার কাছে এখন দোয়া করা ছাড়া কোন উপায় বাকী নেই। আমি দোয়া করি আল্লাহ্‌তা'লা যেন আপনাকে পূর্ণ পদস্খলন থেকে বাঁচান।" এই চিঠির উত্তরে তিনি আমাকে নিজ পক্ষ থেকে আশ্বাস দিয়ে লিখেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছি। এ ব্যাপারে আমার বিষয়ে আপনি আর কখনো কোন নালিশ শুনতে পাবেন না।' এই নতুন বিবাদের এটিই হচ্ছে পটভূমি। এসব বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন এটি বলা না হয় যে, কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, বেশী শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বরং এটি বলা যেতে পারে যে, এই দৃঢ় পদক্ষেপ আরও আগে গ্রহণ করা উচিত ছিল, পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব হয়েছে। যদি এটি ভুল হয়ে থাকে আল্লাহ্‌তা'লা যেন আমাকে ক্ষমা করেন (আমীন)।

এবার যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তার সূচনা মজলিসে শূরায় (জার্মানীর) বিভিন্নভাবে হয়েছে। যদি আমি Audio Cassette এর মাধ্যমে কার্য বিবরণী আনিয়ে না শুনতাম তাহলে আমাকে কেবল এটুকুই বলা হয়েছিল যে, লাজনা ইমাইল্লাহর সদর সাহেবার কোন কথার উপর উক্ত মুরব্বী সাহেব নিজ ক্ষমতার চেয়ে বেশী তার উপর কঠোর সমালোচনা করেন যার ফলে সদর সাহেবা ঘাবরিয়ে যান ও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। প্রথমতঃ মনে হয়েছিল যে, ঘটনা কেবল এটুকুই। কিন্তু পরবর্তীতে আমি যখন সেই ক্যাসেটটি শুনি, আমীর সাহেবের রিপোর্ট পড়ি এবং মুরব্বী সাহেবের রিপোর্ট আনাই তখন নিম্নরূপ বিষয়াদি ধরা পড়ে। আমি এগুলো এজন্যে বর্ণনা করছি যেন আপনারা এবং সারা পৃথিবীর জামাতসমূহ জানতে পারেন যে, মজলিসে শূরা কি, কার কতটুকু ক্ষমতা, কে কিভাবে সীমালঙ্ঘন করে বসে যা জামা'তের জন্যে অগ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। যখন রদকৃত প্রস্তাবাবলী পড়ে শুনানো হচ্ছিল সর্বপ্রথম অঘটনটি তখন ঘটে। আপনাদের জানা উচিত, বাতিলকৃত প্রস্তাবাবলী বলতে সেই সব প্রস্তাব বুঝায় যেগুলোকে খলীফায়ে ওয়াক্তের মঞ্জুরীক্রমে শূরায় উপস্থাপন করার অনুমতি নেই। বরং ঘোষণা হয় যে, অমুক অমুক প্রস্তাব উপস্থাপন করার অনুমতি নেই এবং তাদের উপর কোনরূপ মন্তব্যও করা যাবে না। জার্মানীর মজলিসে শূরায় যখন বাতিলকৃত প্রস্তাবসমূহ ঘোষণা করা হচ্ছিল তখন উক্ত মুরব্বী ইনচার্জ দাঁড়িয়ে বার বার 'সেক্রেটারী শূরা'কে বাধা দেন এবং কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করতঃ নিজের মন্তব্য করা আরম্ভ করেন যে, "আমার মতে এমন হওয়া উচিত ছিল, ইত্যাদি"। এ ধরণের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য কয়েকবার করার পর তিনি বলেন, "আমি আমার সমাপনী ভাষণে এ বিষয়ে আরও কিছু বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরব।" আমীর সাহেব যেহেতু উর্দু জানেন না এবং অনুবাদের উপযুক্ত ব্যবস্থাও ছিল না সে কারণে কিংবা নিজ সীমাতিরিক্ত ভদ্রতা ও বিনয়ের কারণে চুপ করে

থাকেন, সেখানে কিছু বলেন নি। কিন্তু পরে তিনি তাকে বারণ করেন এবং বলেন: "সিল-সিলার যে সব প্রচলিত ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সেগুলিকে ভঙ্গ করে এ ধরণের আচরণ করা আপনার উচিত হয় নি। তাই আপনাকে অনুমতি দেয়া যাচ্ছে না।" এর ফলশ্রুতিতে তিনি (উক্ত নায়েব আমীর) নিরব থাকার স্থলে ফোনের মাধ্যমে 'সেক্রেটারী শূরা'র সাথে যোগাযোগ করেন এবং আমীর সাহেবকে জানাতে বলেন, "আপনি অনুমতি দেননি ঠিকই, কিন্তু তা সত্বেও আমি অবশ্যই বক্তব্য রাখতে চাই।" দেখুন, 'সেক্রেটারী মজলিসে শূরা'কে শূরার সদস্য সরাসরি কোন কথা বলতেই পারে না। তার সাথে কোন সম্পর্কই নেই। মজলিসের সভাপতির সাথে প্রত্যেক সদস্যের সরাসরি যোগাযোগ হয়। 'সেক্রেটারী মজলিসে শূরা' সভাপতির অধীনস্থ একজন কমকর্তা মাত্র, এর চেয়ে বেশী সেখানে তাঁর আর কোন পরিচয় নেই। তা সত্বেও যদি এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করতেই হত, যদিও এই জিদটি সম্পূর্ণ অবৈধ ও বাড়াবাড়ি ছিল, তিনি নিজে নায়েব আমীর বিধায় সরাসরি আমীরের সাথে আলাপ করতে পারতেন। এতদ্‌সত্বেও আমীর সাহেব তাঁকে অনুমতি দেন নি। তিনি খুব ভাল ও সঠিক কাজ করেছেন। কিন্তু তার আগেই উক্ত নায়েব আমীর অনেক অবৈধ কথা বলে ফেলেছিলেন যা সম্পূর্ণভাবে জামাতের ঐতিহ্যের পরিপন্থী ছিল।

দ্বিতীয় আশ্চর্যজনক বিষয় যা আমার কাছে ধরা পড়েছে তা হচ্ছে সমাপনী ভাষণ। আমীর সাহেবের পরিবর্তে নায়েব আমীর সাহেব তা প্রদান করছেন! আবার, আমার পরিষ্কার নির্দেশের বিরুদ্ধে মজলিসে শূরার কার্যধারা উর্দুতে হচ্ছে! অথচ আমি বার বার জোর দিয়ে বলেছি, যে দেশের যে ভাষা জামাতের গতানুগতিক অনুষ্ঠানাদিতে সেই দেশের ভাষাই ব্যবহৃত হবে। 'মজলিসে শূরা' প্রকৃতপক্ষে জামা'তের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যার মাঝে আমার নির্দেশনা সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্বসহ মান্য করা বাঞ্ছনীয়। যদি কেউ উক্ত ভাষা বুঝতে না পারে তার জন্যে অনুবাদ করা যেতে পারে। অনুবাদ বিশেষতঃ এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে করা হবে যদি সে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়, তার কথাটি বুঝা দরকার, তার পরামর্শ প্রয়োজনীয় কিন্তু সে ভাষার বিষয়ে অপারগ। এই ধরণের ব্যতিক্রম করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে, যদি জার্মানীর শূরায় জার্মান ভাষা ব্যবহৃত হয় তার উর্দু অনুবাদ তাদের জন্য করা যেতে পারে যারা জর্মান ভাষা বুঝেন না তবে তাদের আলোচ্য বিষয়টি বুঝা দরকার। এসব নির্দেশনা দেয়া সত্বেও সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতঃ জার্মানীর শূরার কার্যক্রম উর্দু ভাষায় হচ্ছিল। তার উপর, জামাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন ঐতিহ্যকে ভঙ্গ করতঃ আমীর সাহেবের স্থলে নায়েব আমীর সাহেবের সমাপনী ভাষণ রাখা হয়।

তদুপরি সেই সমাপনী ভাষণ এমন ধরণের ছিল যা শুনে শিউরে উঠতে হয়। তা শুনার সময় আমার মনে হল কেউ কেউ যেন খলীফা হতে চান। তারা সেই ধরণটি অবলম্বন করতে চান যা কেবল খলীফার বিশেষত্ব আর জামা'ত সেই ধরণকে খুবই ভালবাসে এবং কেবল

খেলাফতের সম্পর্কের কারণে তা গ্রহণ করে থাকে। এটি জামা'ত এবং খলীফার মাঝে এমন একটি বন্ধন যা অন্য কেউ বুঝতেও পারে না এবং তার মাঝে অন্য কেউ হস্তক্ষেপও করতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য খলীফাদের থেকে পৃথক হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর স্বতন্ত্র আরেকটি ধরণ ছিল এবং সেটি তাঁর স্বত্বায় সীমাবদ্ধ ছিল। আমার তো আজো মনে পড়ে না যে, আমি কখনো সেই বিশেষ কায়দায় কোন বক্তৃতা নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের কথা দিয়ে আরম্ভ করেছি। যেমন, জামা'তের বন্ধুগণ আমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে জানতে উদগ্রীব। তাই আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে, গত কদিন ধরে শরীর অসুস্থ ছিল.....তারপর অমুক অমুক ঘটনা ঘটেছে.....তারপর অমুক ঘটনা.....এভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর বিশেষত্ব ছিল যা জামা'ত অত্যন্ত পসন্দ করত এবং মনোযোগ সহকারে শুনত। কিন্তু তাঁর পরে খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহঃ) কিংবা আমি কখনো এভাবে করি নি বরং সব সময়ে ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলার জন্য জামা'তী সময় খরচ করতে লজ্জাবোধ করে এসেছি। কিন্তু মজলিসে শূরায় এ ধরণের কথাবার্তার তো প্রশ্নই উঠে না। যদি দোয়ার আবেদন করতে হয় তবে জামা'তের প্রত্যেক সদস্য তা করাতে পারে তবে সাধারণতঃ ইহা জলসায় ঘোষণা করা হয়। যদি 'শূরায়' দোয়ার আবেদন করতেও হয় তবে সাধারণভাবে করানো যেতে পারে যা আমীরের পক্ষ থেকে একজন পড়ে শুনাতে পারে। কিন্তু উক্ত ভাষণের ভূমিকা এই বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল।

এরপর তিনি বলেন, "আমি লাজনার সদর সাহেবা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই, এই বিষয়টি আমি আমার সমাপনী ভাষণের জন্য সংরক্ষিত রেখেছিলাম।" সদর সাহেবা লাজনা কোন ভুল কথা বলছিলেন কি বলেন নি এটি একটি পৃথক বিষয়। আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, মজলিসে শূরায় যদি কেউ অনুচিত কথা বলেন কিংবা নিজের ক্ষমতার বাইরে কোন কথা বলেন তখন শূরার প্রত্যেক মেম্বরের অধিকার রয়েছে বরং তার দায়িত্ব হচ্ছে যে, তিনি যেন আদবের সাথে উঠেন এবং আমীরের অনুমতিক্রমে উক্ত ভুলের দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তার উচিত তিনি যেন হাত উঠান, আমীরের সামনে দাঁড়ান এবং বিনীতভাবে বলেন, "আমার মতে এটি জামা'তের রীতিনীতির বিরোধী বিষয়, এ ধরণের কথা বার্তা মজলিসে শূরায় হওয়া ঠিক নয় কিংবা এ ধরণের কথাবার্তার সাথে আলোচ্য বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই।" প্রত্যেকের এটি বলার অধিকার আছে। কিন্তু আমীর সাহেব যদি না শুনেন কিংবা শুনার পর পরামর্শ গ্রহণ না করেন তবে এ বিষয়ে মুখ খোলার কারও কোন অধিকার থাকে না। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি আমীরের মাধ্যমে খলীফাতুল মসীহ্‌র মনোযোগ সেদিকে আকর্ষণ করতে পারেন যে, "আমাদের শূরায় এ ধরণের কথা উঠেছে। আমার মতে এটি জামা'তের নীতি বিরোধী কথা। যদি আমি সঠিক হই তবে আমীর সাহেবকে যেন আগামীতে এ বিষয়ে খেয়াল রাখার জন্য বলা হয়। আর যদি আমি ভুল বুঝে থাকি

তা হলে আমার সংশোধন করে দিন।" —এটি একটি ভদ্র, শালীন, সঠিক ও তাক্‌ওয়া প্রসূত পদ্ধতি। কিন্তু আমি যার কথা বলছি, তিনি শূরা চলাকালীন সময়ে আমীর সাহেবের কাছে বিনীত ভাবে নিজের আপত্তির কথা না বলে নিজের কথা বলার 'হক' সংরক্ষণ করলেন। মনে হয় যেন স্বয়ং খলীফায়ে ওয়াক্ত সমালোচনা করছেন। তার সমালোচনার ধরণ নিঃসন্দেহে কেবল আমীর সাহেবের চেয়েই বড় নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে খলীফায়ে ওয়াক্তের উর্ধ্বে। সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'অমুক নামের মহিলা যিনি কাদিয়ানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা তাঁর বক্তৃতা অতীব উত্তম ও চমৎকার ছিল। আমি লাজনার সদর সাহেবাকে পরামর্শ দিচ্ছি তিনি যেন এ ধরণের চমৎকার তরবীয়তপ্রাপ্তা মহিলাদের কাছ থেকে পথ-নির্দেশনা নেন এবং তাঁদের হেদায়াত, উপদেশ ও অভিজ্ঞতার আলোকে যেন লাজনার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।" ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। খলীফায়ে ওয়াক্ত একজনকে সদর লাজনা ইমাইল্লাহ নিয়োগ করেছেন আর ওদিকে একজন নায়েবে আমীর দাঁড়িয়ে নিজের মুরব্বীপনার সম্পূর্ণ অপব্যবহার করতঃ এ ধরণের পরামর্শ দিচ্ছেন। তাও আবার একজন মহিলার নাম নিয়ে এমনভাবে প্রশংসা করেছেন যেভাবে যুগের খলীফা কখনো কখনো উত্তম সেবিকাদের নাম নিয়ে প্রশংসা করে থাকেন। কিন্তু খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষে একথা বলা অসম্ভব যে, আমি যাকে সদর নিযুক্ত করেছি তাঁর অধীনস্থ কোন সদস্যা তাঁর উর্ধ্বে এবং নির্ধারিত কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলীর বাইরে অমুক সদস্যাকে মান্য করা এবং তার কাছ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। অর্থাৎ আমার নিযুক্ত 'সাদারাত'কেও তিনি বাতিল করে দিলেন এবং যেভাবে যেভাবে নিজে আমীরের উর্ধ্বে আমীর হয়ে গিয়েছিলেন সেভাবে নিজের তরফ থেকে সদরের উর্ধ্বে আরেকজনকে সদর ধার্য করে দিলেন। অতীব বাজে কাজ করলেন তিনি। তবে আমার একটি নির্দেশ অমান্য করলে যা হবার ছিল তাই হয়েছে—উর্দু ভাষায় কথাবার্তা হচ্ছিল। অনুবাদ যে কি ধরণের হচ্ছিল জানি না; কিন্তু সে সময় কি হচ্ছে আমীর সাহেব বুঝতে পারছিলেন না। পরবর্তীতে আমীর সাহেব যখন রিপোর্ট পেলেন তখন সে বিষয়ে মজলিসে আমেলায় আলোচনা আরম্ভ হয়। মজলিসে আমেলায় আলোচনার যে ধরণ অবলম্বন করা হয় তা শূরার চেয়েও অপসন্দনীয় এবং অপবিত্র ছিল।

শূরায় আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল যার কারণে মোকররম আমীর সাহেব তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সেটি হল, নিজে নিজেই তিনি ঘোষণা দেন যে, আগামীতে জার্মানীর জামা'ত একশ' মসজিদ নির্মাণ প্রকল্পের সাফল্যের জন্যে প্রতি বৃহস্পতিবার নফল রোযা রেখে দোয়া করবে। আমার মনে আছে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) একবার শেষ বৃহস্পতিবার রোযা রাখার তাহরীক করেছিলেন অর্থাৎ মাসে একটি রোযা। সেটি শতবার্ষিকী জুবলীর সাফল্যের জন্যে ছিল। এছাড়া কোন আমীর নিজ পক্ষ থেকে এ ধরণের কোন তাহরীক করেছেন বলে আমার জানা নেই। কমপক্ষে আমি তো করি নি। কেননা এসব বিষয়গুলোকে ধীরে ধীরে এক ধরণের লোক দেখানোর কাজ বানিয়ে ফেলা হয়, যেমন বলা হয়, অমুক দিন

রোযা রাখা হবে। মানুষ কখন রোযা রাখে? যতক্ষণ মন বিগলিত না হয় কিংবা মনে বিশেষ টান সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়াকেও 'খেলার বস্তু' বানানো উচিত নয়। যদি কোন আমীরের প্রস্তাবে এ ধরণের কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয় তবে এটি খলীফাতুল মসীহর কাজ। এর বাইরে যদি সবাই রোযা কিংবা নফল ইবাদতের বিশেষ তাহরীক চালাতে আরম্ভ করে তাহলে এ ধরণের কাজ সম্পূর্ণ ভুল এবং জামা'তের রীতি বিরোধী। যখন মোকাররম আমীর সাহেব মজলিসে আমেলায় এই কথা তুল্লেন তখন উক্ত নায়েব আমীর উঠে দাঁড়ান এবং আমীর সাহেবকে বলেন, "যদি এটিই আপনার মতামত হয় তবে জার্মানীর জামা'ত আমার মত মানুষকে কাজে লাগাতে পারবে না, এই রইল কাগজপত্র, আপনাদের যা ইচ্ছা করুন. আমার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।' এই বলে কাগজপত্র ছুঁড়ে দিলেন তিনি। "যদি আমার নির্দেশনার অধীনে আমীর সাহেব এবং মজলিসে আমেলা চলে তবে ঠিক আছে তা না হলে এই রইল আপনাদের পদবী, আমার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।" যখন আমি এই অংশটি পড়ছিলাম তখন আমি নোট লিখলাম "আপনি যখন টেবিলের উপর কাগজ ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন তখন প্রকৃতপক্ষে আপনি বলছিলেন, 'এই রইল আমার ওয়াকফ আর এই থাকল আমার সারা জীবনের ধর্ম-সেবা, জাহান্নামে যাক, আমার সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই"। সেই একই বৈঠকে তিনি আমীরকে বলেন, "আমীর সাহেব! আপনি আমার পরামর্শের অপেক্ষা না করে আমার বিরুদ্ধে কেন কমিশন নিযুক্ত করেছেন? আপনি কমিশন বসানোর কে? আমি আপনার কোন কমিশনের সামনে উত্তর দিতে বাধ্য নই।"—এটি ছিল প্রকাশ্য ও খোলাখুলি বিদ্রোহ। আমীর সাহেব যদি অভিজ্ঞ হতেন তবে বলতেন, 'এখান থেকে এই মুহূর্তে বের হয়ে যাও। আমি তোমাকে পদচ্যুত করছি এবং আমি খলীফাতুল মসীহকে সুপারিশ করছি যেন এ ধরণের লোককে জামা'তে না রাখেন।' কিন্তু তিনি একজন সাদা-সিদা ভদ্র মানুষ তার উপর লোকেরা অত্যাচার চালিয়েছে এবং তিনি চুপচাপ সহ্য করে এসেছেন। জার্মানীর জামা'তে আহ্‌মদীয়ার এটি দুর্ভাগ্য যে. এমন ভদ্র, নরম মেযাজ এবং উত্তমমানের মুত্তাকী আমীরের অবমাননা করে এসেছে জার্মানীর মজলিসে আমেলা। আমার মন এ কথাগুলো শুনে জ্বলে উঠেছে। আমি একবার উক্ত মুরব্বী ইনচার্জকে এ পর্যন্ত লিখেছিলাম, "আমি স্বীকার করি আপনাদের আমীর সাহেবের মাঝে অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযলে তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী, স্পষ্টভাষী এবং সৎ মানুষ। আমি খলীফা হয়েও তাঁকে সম্মান করি। আমি অনুরোধ করছি আপনি মুরব্বী হিসেবে তাঁর সম্মান করুন।" এই পত্র তিনি অনেক আগেই পেয়েছেন। আমার কাছে সব পত্রাদির রেকর্ড এবং তারিখ সংরক্ষিত রয়েছে। তা সত্ত্বেও সম্মানের অবস্থা এই হয়েছে যে, দু'টি বিষয়ে প্রকাশ্যে "বিদ্রোহ" এবং আরেক সময়ে তিনি আমীর সাহেবকে বলেন, "আমি জানি আপনি মহিলাদের অধীনস্থ হয়ে গেছেন, সদর লাজনা ইমাইল্লাহর কথা মানছেন। মহিলাদের কথা মত চলছেন। আপনার পেছনে যে দলটি কাজ করছে তাকে আমি খুব ভালই চিনি। আবার

আমাকে নিজের বুদ্ধিমত্তার বাহার দেখানোর জন্যে লিখেছেন, "আমি তো একবার আমীর সাহেবকে আলাদা বলেছিলাম যে, আপনার ও আমার মধ্যে অনৈক্য হওয়া উচিত নয়। তা না হলে যদি আপনি আমাকে পৃথক রাখেন আর আমার পরামর্শ না শুনেন তবে যারা আপনার সংগীদের ব্যাপারে বিরূপভাবাপন্ন তারা সব আমার কাছে আসবে আর এরূপে জামা'তে দু'টি ভাগ হয়ে যাবে।" অর্থাৎ তিনি নিজের থেকেই বিরোধীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে নিলেন। এটি বললেন না যে, আমীর সাহেব! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যত বড় মানুষই আপনার বিরুদ্ধে কথা বলতে বলতে আমার কাছে আসবে আমি তাকে বলব, 'তুমি বিতাড়িত শয়তান এখান থেকে বেরিয়ে যাও, আমীরের বিরুদ্ধে আজেবাজে কথা আমি কোন মতেই সহ্য করব না'। আমীরকে খলীফায়ে ওয়াক্ত নিযুক্ত করেছেন এবং হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত করেছেন। এপ্রসঙ্গে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর স্থায়ী এরশাদ হচ্ছে :

من عصا أميري فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله -

যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করেছে সে আমাকে অমান্য করেছে, যে আমাকে অমান্য করেছে সে আল্লাহ্‌কে অমান্য করেছে। সারা জীবন এসব মুখস্থ করে করে শেষ বয়সে মুরব্বীয়ানরা এটি বুঝতে পারলেন না যে, আনুগত্য কাকে বলে এবং নিষ্ঠা কোন্ বস্তুর নাম! বার বার আমার একথা লিখা সত্বেও যে, আমি এই মানুষটিকে (অর্থাৎ আমীরকে) সম্মান করি, আপনিও করেন" মুরব্বী সাহেব সম্মান প্রদর্শনের এই অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করলেন। তার কতিপয় সংগীরাও একই পথ অবলম্বন করেছেন যা অত্যন্ত জঘন্য। আমি এখন বিস্তারিতভাবে তাদের নাম নিতে চাই না কিন্তু এই দুর্গন্ধ আমি অনেক দিন ধরে পাচ্ছিলাম। আমি তাদের সংশোধন চেয়েছিলাম, ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে, আমি দোয়া করতাম আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে পদস্খলন থেকে বাঁচান। তাদের মাঝে ভাল ভাল কাজের মানুষ ছিলেন। কিন্তু যেখানে জামা'তের স্বার্থের প্রশ্ন উঠে সেখানে কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ককে আমি অন্তরে স্থান দিতে পারি না—এর প্রশ্নই উঠে না। এরা ঐসব লোক যাদের প্রত্যেকে আমাকে অত্যন্ত বিনয় ও নিষ্ঠার সাথে পত্র লিখে। তাদের মাঝে কয়েকজন আমাকে লিখেছেন, 'আমরা আপনার পায়ে চুমু খেতে চাই কিন্তু আমরা জানি যে, আপনি আপনার বিনয় ও নম্র স্বভাবজনিত লজ্জার কারণে তা করতে দিবেন না। আমার এই সব বাক্যের এবং পায়ে চুমু খাওয়ানোর কোন ইচ্ছেও নেই, বিন্দুমাত্র কদরও নেই। যুগের খলীফা একটি নিযামের প্রতিনিধি। আপনারা সবাই মিলে খলীফা এবং আপনাদের সবার সমন্বিত রূপ খলীফায়ে ওয়াক্ত। যে আপনাদের সবার অর্থাৎ নিযামে জামা'তের সম্মান করে না সে যদি দাবী করে যে, আমি খলীফায়ে ওয়াক্তের সম্মান করি তবে সে তার দাবীতে মিথ্যাবাদী।

এগুলো এমন সব বিষয় যেগুলো সম্বন্ধে কুরআন করীম খুব পরিষ্কারভাবে আলোকপাত করেছে এবং ভালভাবে বার বার এই বিষয়কে তুলে ধরেছে। কুরআন করীম বার বার বলেছে,

যারা আল্লাহ্ ও রসূলদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের সমস্ত আমল বেকার ও নিষ্ফল তার কোন মূল্য নেই। প্রথম প্রথম আমি বুঝতে পারতাম না যে, আল্লাহ্ এবং রসূলদের মাঝে বিভেদ বলতে কি বুঝায়! কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে জানলাম যে, এ ধরণের লোক বলে, খলীফায়ে ওয়াক্তের কথা একেবারে শিরোধার্য। দরকার হলে আমরা আমাদের সন্তানদের জীবনও উৎসর্গ করে ফেলব। কিন্তু আমীরের কথা ভিন্ন। সদর খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া কিংবা অমুক ব্যক্তির কথা ভিন্ন। তার সাথে আমাদের বিবাদ ও শত্রুতা আছে কিন্তু খলীফার কথা কে ফেলতে পারে। আল্লাহ্ ও রসূলদের মাঝে এই ধরণের লোকেরাই বিভেদ সৃষ্টি করে থাকে, তারা রসূলের কোন কথায় রাগ করে হয়ত বলে বসে যে, আল্লাহ্‌র কথা তো শিরোধার্য কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে রসূলের আনুগত্য সম্ভব নয়। এটিই সেই শয়তানী প্ররোচনা যা ক্রমান্বয়ে নীচু স্তরে সংক্রামিত হয়। কখনো কখনো আমীরের অধীনস্থ নিযামে এই ফিৎনা দেখা দেয় যে, আমীরের কথা অবশ্যই মান্‌ব কিন্তু তার নিযুক্ত অমুক কর্মকর্তা ঠিক নয়।

এই ফিৎনা কিভাবে সৃষ্টি হয় তা কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা রূপক ভাষায় প্রথমাংশেই বর্ণনা করেছেন এবং বার বার বর্ণনা করেছেন এবং আমি তা বার বার বর্ণনা করেছি। কিন্তু যে সব কান বধির হয়ে গেছে তারা শুনতেই পারে না আর বুঝতেই পারে না যে, কি বলা হচ্ছে। খোদাতা'লা ফিৎনার নিগুঢ় রহস্য আমাদেরকে ইবলীসের ঘটনা দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ইবলীসের অবাধ্যতা তার আমিত্বের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে সে নিজেকে বড় মনে করে। কিন্তু খোদার চেয়ে বড় নয় বরং খোদার মনোনিত আমীরের চেয়ে নিজেকে বড় মনে করেছিল তার চেয়ে নিজেকে বড় মনে করেছিল তার চেয়ে নিজেকে ভাল মনে করেছিল। সে একথা বলে নি যে, "হে খোদা! আমি তোমাকে মানি না কিংবা তোমার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করি না বরং সে বলেছিল, যাকে তুমি আমীর বানিয়েছো সে আমার চেয়ে ছোট ও অস্তিত্বহীন, আমার তুলনায় সে কিছুই না। أنا خير منه এটি কত গভীর একটি তত্ব। এটি গভীর হিকমতের কথা! হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মীয় ইতিহাসে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কিন্তু মূর্খ মানুষ বিষয়টি বুঝতে পারে না। যার চোখে আলো নেই বাইরের আলো সে দেখতে পায় না। আর কোথায় কি হচ্ছে বুঝতেই পারে না। যখনই জামা'তে কোথাও কোন ফিৎনা দেখা দিয়েছে এভাবেই দেখা দিয়েছে!

বলা হয়, "যদি খুব বড় অফিসার হন তাহলে তাঁর কথা একশ'বার মানবো। কিন্তু মধ্যখানে এই ছোট অফিসারটি পাক্কা শয়তান, এর কথা আমরা মানতে রাজী নই।" যদি সে সত্যিই শয়তান ও অযোগ্য ব্যক্তি হয়ে থাকে তাহলে তার উপরস্থ কর্মকর্তাকে যেমন: আমীর কিংবা খলীফাকে বিষয়টি আদব ও ভদ্রতার সাথে জানানো তোমাদের দায়িত্ব। তাদেরকে লিখুন, "যতক্ষণ পর্যন্ত অমুক ব্যক্তিকে আপনি কর্মকর্তা নিয়োগ করে রাখবেন ততক্ষণ আমরা অবশ্যই তার আনুগত্য করব। কিন্তু আমাদের নিবেদন হচ্ছে যে, উক্ত ব্যক্তি

কর্মকর্তারূপে আপনার প্রতিনিধিত্বের যোগ্য নয়, সে জামা'তের নিযামকে কলঙ্কিত করছে, অমুক ভুল করছে।" এ ধরণের কথা লিখে জানানো কোনক্রমেই বেআদবী নয়, শয়তানীও নয়। কিন্তু এ ধরণের রিপোর্ট পেশ না করে, সংশোধনের চেষ্টা না চালিয়ে নিজে নিজে কর্মকর্তার নির্দেশ অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেয়া এবং "আমরা তার কথা মানব না" ঘোষণা দেয়া অবশ্যই ইবলিসীয়ত। এই ইবলিসীয়তের উল্লেখ কুরআন করীমের প্রারম্ভেই করা হয়েছে এবং বার বার কুরআনে এর পুনরাবৃত্তি করে আমাদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, মনে রেখো, আগামীতে যখনই ফিৎনা মাথা চারা দিবে এভাবেই আত্মপ্রকাশ করবে। যতটুকু আমি দেখেছি ও বুঝেছি, আমি আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে আপনাদেরকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, কুরআন করীম বর্ণিত ফিৎনার তত্ত্ব হুবহু একইভাবে পুনরাবৃত্ত হয়। সেই একইভাবে মানুষের আত্মা তাকে ধোকা দেয়! এরই নাম তাক্‌ওয়ার অভাব, এরই নাম "আমিত্ব" যা পরে অহংকারে পরিণত হয় এবং বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়।

আরেকটি বিষয় আমরা কুরআন করীম থেকে জানতে পারি। সেটি হ'ল, আনুগত্যের সাথে আদব আবশ্যক। খালি আনুগত্য যথেষ্ট নয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে কুরআন শরীফ বলে, 'তাঁর সামনে গলার স্বর উঁচু করবে না। যারা তাঁর সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে তাদের অজান্তেই তারা নিজ ঈমান হারিয়ে বসেন।" এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, সত্যিকার আনুগত্য আদব ছাড়া সম্ভবই নয়। আন্তরিকতাশূন্য আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের কোন মূল্য নেই বরং তা এ ধরণের আনুগত্যকারীদের জন্যে স্থায়ী বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং যখন কাউকে আমীর বা কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় তখন তার সাথে ভালবাসা ও আদব-ভক্তির সম্পর্ক গড়ে তোলা আবশ্যক। আপনি যদি তাকে নিজের থেকে ছোট মনে করে আনুষ্ঠানিকতার আনুগত্য করতেও থাকেন এ ধরণের আচরণ আপনার জন্যে বিপদের কারণ হয়ে থাকবে। আপনি যে কোন সময়ে হোঁচট খেতে পারেন।

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এ বিষয়ে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বার বার তুলে ধরেছেন। একবার তিনি বলেন, "তোমাদের উপর যদি একজন কৃষ্ণাঙ্গ আমীর নিয়োগ করা হয়.....'। আরবরা নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্যে ভীষণ গর্বিত ছিল। কোন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি তাদের আমীর (নেতা) হবে এ কথা তারা কল্পনাও করতে পারত না। কত সুন্দরভাবে সেই উপমাটি দিয়েছেন যা আরবদের কাছে সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য। তারপর হুযুর (সাঃ) বলেন, "কৃষ্ণাঙ্গ হলেও মানতে হবে আবার ক্রীতদাস হলেও আনুগত্য করতে হবে"। আরবদের জন্যে একজন ক্রীতদাসের আনুগত্য করা তো একটি অসম্ভব বিষয় ছিল। একথা তারা ভাবতেই পারত না এবং এ বিষয়ে তারা ভীষণ বিদ্বেষ পোষণ করত। আবার তারা নিজেদের সর্দারী ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গর্ব করে বেড়াত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "তার মাথা যদি শুকনো কিশমিশের মতও হয় তবুও মানতে হবে"। শুকনো মাথা অর্থাৎ নির্বোধ ও উন্মাদের হলেও,

যদি এ ধরণের আমীরও তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হয় তথাপি তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের জন্যে ফরয। এই হচ্ছে 'আমারাত' ও 'আনুগত্য' প্রসঙ্গে ইসলামী শিক্ষা যা আঁ-হযরত (সাঃ) ভালভাবে পরিষ্কার করে আমাদেরকে বুঝিয়ে গেছেন।

কুরআন শরীফ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এসব অধিকারগুলো খুব ভালভাবে সংরক্ষণ করেছে। হুযুর (সাঃ)-এর অনুসারীদের নিরুৎসাহিত করার জন্য শয়তান যেসব প্ররোচনা ছড়াতো সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ কুরআন করীমে সংরক্ষিত আছে। ইহা ফিৎনার সব ক'টি দিক চিরদিনের জন্যে ভালভাবে বর্ণনা করে রেখেছে। কুরআন শরীফে বর্ণিত ফিৎনাসমূহের বিভিন্ন আঙ্গিকের বাইরে দুনিয়ায় একটিও ফিৎনা নেই। মুসলমানদের জন্যে সব ধরণের সতর্কীকরণ সত্বেও পুনরায় শয়তানের কবলে পড়া চরম বোকামী বরং এক ধরণের আত্মহত্যা।

কুরআন করীম বলে, কখনো কখনো লোকেরা অধীনস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, প্রত্যক্ষভাবে বড় নেতার বিরুদ্ধে কথা বলে না। বড় নেতাকে তারা পরোক্ষভাবে কথা বলে। কুরআন শরীফে উদাহরণ আছে, তারা বলে 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে তো খুব বিচক্ষণ, বুদ্ধিদীপ্ত এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, কিন্তু মধ্যখানে যেগুলো পরামর্শদাতা রয়েছে এগুলো হচ্ছে আস্ত মুসিবত। হুযুর (সাঃ)-এর দুর্বলতা হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন 'اذن' (কান) অর্থাৎ তিনি মানুষদের কথায় কান দেন আর যে যা বলে তিনি মেনে নেন। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ বলেছেন, 'তুমি তাদের বলে দাও "اذن خير لكم" অর্থাৎ তিনি এমন এক সত্তা যিনি লোকের কথা শুনেন ঠিকই কিন্তু কেবল ভাল কথা গ্রহণ করেন আর অমঙ্গলজনক কথাকে বাদ দিয়ে দেন। তার পক্ষে اذن হওয়া (অর্থাৎ সবার কথা শুনা) তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক, যদি তিনি তোমাদের কথায় কান না দিয়ে নিজের বালাখানায় লুকিয়ে থাকতেন তাহলে তোমরা কাঁদতেই থাকতে, 'হায়! আমাদের কথা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছায় না'। তিনি আল্লাহ্‌র এমন এক বিনীত বান্দা যিনি তাঁর অন্যান্য বিনয়ী ও সমাজের দৃষ্টিতে অকর্মণ্য মানুষের জন্যেও ঝুঁকে যান এবং তাদের কথা অমায়িক ভালবাসার সাথে শুনেন। তোমরা এমন অকৃতজ্ঞের দল যে, তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করছ। তোমরা বুঝতে পারছ না যে, হুযুর (সাঃ) যেভাবে লোকদের কথা অতি বিনয় ও ভালবাসা দিয়ে শুনেন এবং তারপর ভালমন্দ বিচার করেন এই মর্মে তাঁর اذن হওয়া তোমাদের জন্যে অতি মঙ্গলজনক।

এই যুগে জামা'তের মধ্যে যে সব ফিৎনা মাথা চারা দিয়েছে সেগুলোর সূচনা ইবলিসীয়তের মতই أنا خير منه হয়েছে। সরাসরি খলীফা কর্তৃক নিয়োগকৃত কর্মকর্তা হউন বা অন্য কোন কর্মকর্তা প্রথমে এককভাবে তাকে লক্ষ্য করে দ্বন্দ্ব খাড়া করা হয়েছে আর দাবী করা হয়েছে (أنا خير منه) আমরা তার চেয়ে উত্তম এবং সম্পূর্ণরূপে তার অধীনস্থ হতে পারি না। আবার কখনো বা খলীফায়ে ওয়াক্তের উপর এই বলে আক্রমণ করা হয়

"তিনি অমুকের কথা শুনেন'। আমি নাম উল্লেখ করতে চাই না। তথাপি জামা'তে আহ্‌মদীয়ায় বার বার এ ধরণের ঘটনা ঘটতে দেখেছি। ফিৎনাকারীরা কখনো একজনকে আবার আরেক ঘটনায় আরেকজনকে 'আক্রমণের লক্ষ্যস্থল' নির্ধারণ করে জড়িত করে এসেছে। কেউ কেউ বলতো, 'হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহঃ) মৌলভী আবুল আতার কথা শুনে আমাদের বিরোধী হয়ে গেছেন। কিংবা অমুকের কথা শুনে আমাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছেন অথবা অমুক আমীরের কথায় আমাদের বিপক্ষে চলে গেছেন। এটি ফিৎনার হুবহু সেই রূপ যা কুরআন শরীফ বর্ণনা করেছে এবং খণ্ডন করেছে। কিন্তু সরল সহজ মানুষ, যারা এসব বিষয় জানেন না তারা বিপথগামী হয়ে যান।

জার্মানীর জামা'তেও এই একই ফিৎনা নতুন করে মাথা চারা দিয়েছে। আমীর সাহেব সম্বন্ধে ইহা বলাবলি হয় যে, তিনি নাকি মুবাশ্বের বাজওয়ার কথায় নাচছেন। মুবাশ্বের বাজওয়ার কাছে তিনি শুনেন। আমি ভেবে পাই না যে, যাদের অন্তরে আমীরের জন্যে তথা নিযামের জন্যে কিছুমাত্র আত্মাভিমান ছিল তারা কেন এসব কথাবার্তা চুপ করে সহ্য করলেন? তারা উঠে এর প্রতিবাদ করে কেন বল্লেন না, "এগুলো শয়তানের কথাবার্তা। হয় তোমরা এগুলো ছড়ানো থেকে বিরত হবে নচেৎ খলীফাতুল মসীহ্‌র কাছে আমরা তোমাদের নামে নালিশ করবো।" কিন্তু তা না করে তারা এই কথাবার্তা শুনতে থেকেছেন এবং কথাটি ছড়ানোর সুযোগ দিয়েছেন। জার্মানী জামা'তের এই ফিৎনা উক্ত শেষ মজলিসে আমেলায় চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। উক্ত 'মুরব্বী ইনচার্জ' আমীর সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন: "আমীর সাহেব! আপনি আপনার পরমর্শদাতাদের কথা শুনা থেকে বিরত হোন। তা না হলে পরিণাম ভয়াবহ হবে।" এই কথাটি আমেলার মজলিসে পর পর কয়েকবার তিনি বলেন। মজলিসে আমেলা চলাকালীন একজন সদস্য দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমীর সাহেব! আপনাকে খলীফায়ে ওয়াক্ত পরামর্শের দু'টি উৎসের মাঝে সীমাবদ্ধ করেছেন যার বাইরে পরামর্শ করার অধিকার বা অনুমতি আপনার নেই। একটি হচ্ছে নায়েব আমীর অপরটি মজলিসে আমেলা। তাই আমরা আপনাকে সাবধান করছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি উক্ত দুই উৎসের কথা না শুনবেন (অর্থাৎ কার্যতঃ তাদের অধীনস্থ না হবেন), আপনি আপনার আমারত চালাতে পারবেন না। আমি এ কথা জানার পর আমীর সাহেবকে বললাম, "উক্ত সদস্যকে অনতিবিলম্বে কাল ব্যয় না করে এক্ষুণি মজলিস থেকে বের করে দিন। কার্যতঃ একজন সদস্য যিনি এর প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি ছাড়া আপনার গোটা মজলিসে আমেলাই বাতিল।" তাদের আত্মাভিমান বলতে কিছু নেই কি? তারা কেন প্রতিবাদ করে বল্লেন না, আমীর সাহেবের পরামর্শদাতা নিরূপণকারী তুমি কে? আমীরুল মুমেনীন কোথায় বলেছেন যে, আমীর নায়েব আমীর ও মজলিসে আমেলার বাইরে কার সাথে পরমর্শ করতে পারবেন না?" কয়েক বছর ধরে ভেতরে ভেতরে এই ফিৎনা ছড়িয়াছে। আমীরুল মুমেনীন কোথায়

বলেছেন যে আমীর, নায়েব আমীর ও মজলিসে আমেলার বাইরে কারও সাথে পরামর্শ করতে পারবেন না?" কয়েক বছর ধরে ভেতরে ভেতরে এই ফিৎনা ছড়িয়েছে। এই ক'বছরের মধ্যে এক মাত্র একবারও কেউ আমাকে এটি জানাতে পারল না যে, মুবাশ্বের বাজওয়া কিংবা অন্য কেউ আমীর সাহেবকে অমুক ভুল পরামর্শ দিয়েছেন এবং আমীর সাহেব তার কথায় অমুক পদক্ষেপ নিয়েছেন। যদি তা জানানো হত তাহলে আমি অবশ্যই সে বিষয়ে যাচাই করতাম, কেন আমীর সাহেব এক ব্যক্তি দ্বারা এত প্রভাবান্বিত যার কারণে ভাল-মন্দ বাছ-বিচার না করেই তার কথা মেনে চলেছেন? কিছু কিছু লোকের বেশী বেশী পরামর্শ দেয়ার বাতিক থাকে। মুবাশ্বের বাজওয়া সাহেবেরও এই বাতিক আছে। তিনি আমাকেও লম্বা লম্বা চিঠি লিখে থাকেন। আমি তাঁর কাছ থেকে কখনো কখনো ২০/২২ পৃষ্ঠার পরামর্শ সুলভ পত্র পাই। আমি কখনও সাহস হারাই নি। কারও এটি বলারও অধিকার নেই, 'দেখুন! মজলিসে শূরা কিংবা আপনার নায়েবদের পরামর্শ ছাড়া অন্য কোন পরামর্শ নিতে আপনাকে আল্লাহ্‌তা'লা বারণ করেছেন। খবরদার! আপনি মুবাশ্বের বাজওয়ার পরামর্শ শুনবেন না।' আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত জামাতের স্বার্থবিরোধী কোন পরামর্শ তিনি আমাকে দেন নি। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে প্রয়োজনের অধিক পরামর্শ প্রদানে প্রবণতা দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু বুদ্ধি-বিবেকও ভালই দিয়েছেন। ভাল ভাল পরামর্শ তিনি দিয়েছেন। এটি আপনারা বলতে পারেন যে, তিনি বিনা কারণে অহেতুক বেশী পরামর্শ দিয়ে থাকেন কিন্তু একথা একদম ভুল যে, তাঁর পরামর্শগুলো অপবিত্র ও জঘন্য উদ্দেশ্য প্রসূত কিংবা তাঁর পরমর্শের কারণে জামাত ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে আজ পর্যন্ত এমন একটি উদাহরণও আমার জানা নেই। আমি তার পত্রের উত্তরে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলি: "জাযাকুমুল্লাহ, আপনার পরামর্শ পেলাম। যখন যেটুকু দরকার হবে আপনার পরামর্শ কাজে লাগাব। কিংবা লিখে দেই: আপনার প্রেরিত বেশীর ভাগ পরামর্শ আগের থেকেই পালিত হয়ে আসছে। বাড়তি পরামর্শ পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ 'জাযাকাল্লাহ'। এই পদ্ধতিতে ক্ষতি কোথায়? বেচারার একটু বাতিক আছে। তাঁর মন রাখলে ক্ষতি কি? কিন্তু এ কারণে রেগে জ্বলে পুড়ে যাওয়ার তো কিছু দেখি না। এ কারণে হিংসা বিদ্বেষ প্রসূত প্রপাগাণ্ডা (ষড়যন্ত্র) আরম্ভ করার তো কিছু নেই। আবার বলা হয়েছে, যেহেতু মুবাশ্বের কেবল পরামর্শদাতাই নয় বরং আমীরের আত্মীয়ও বটে তাই আমীর তার কথা মেনে যাচ্ছে এবং তার কথায় নেচে যাচ্ছে। এটি একটি অভিশপ্ত প্রপাগাণ্ডা। যদি এই লোকেরা তওবা না করে তবে খোদার দৃষ্টিতে 'কোপগ্রস্ত' হবে এবং শাস্তি পাবে। প্রকৃতপক্ষে এই লোকেরা আমার সাথে কৃত বয়াতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলেছে, আমার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই কেননা বারে বারে তাদের উপদেশ দেয়া সত্বেও বার বার ঘন্টার পর ঘন্টা তাদেরকে বুঝানো সত্বেও তাদের টনক নড়ে নি। তারা এভাবে বলতে পারতেন যে, অমুক ব্যক্তি উপদেষ্টা বনে বসেছেন। প্রতিবার তিনি ভুল পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন যার কারণে অমুক অমুক

ক্ষতি সাধিত হয়েছে—তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ খোঁজ খবর নিতাম। কিন্তু তারা কখনো এরূপ করেন নি।

এ কথা সঠিক যে, আমীরও ভুল করতে পারেন, করেও থাকেন। কিন্তু আমীরের ভুল শুধরানোর একটি পদ্ধতি আছে। আমীরের উর্ধ্বে খলীফা রয়েছেন, বরং খলীফার নীচেও এমন কিছু কর্মকর্তা রয়েছেন যাদের সাথে আমীরের ভুল সংশোধনের কার্যকলাপ জড়িত, যেমন: নাযের আলা, ওয়াকিলে আলা, বিভিন্ন আঞ্জুমানের সদর সাহেবগণ প্রমুখ। কিন্তু কাউকে নিজে নিজেই আমীরের উর্ধ্বে "নেগরান" (তদারককারী) বলে তাঁর দোষ ধরার অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। কেবল একটি ক্ষেত্রে জামা'ত আমীরের আনুগত্য করা থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং সেটি হচ্ছে (যদি আল্লাহ্ না করুন) আমীর খলীফার কোন স্পষ্ট আদেশ প্রকাশ্যে ও ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করে এবং ঐ ব্যাপারে ঔদ্ধত্য দেখায়। সে ক্ষেত্রে কার্যতঃ আমীর নিজ 'আমারত' থেকে দূরে সরে যায়। কেননা নিযুক্তকারীর প্রদত্ত ক্ষমতাবলী থেকে সে সীমালঙ্ঘন করছে। আনুগত্য না করার এটিই একমাত্র কারণ যা আল্লাহ্‌র ফযলে আমাদের জামা'তে নেই বল্লেই চলে। আমার খেলাফতকালে একটি ঘটনা ছাড়া আমি কোন আমীরকে এমন পাই নি। আমীর তাঁরাই হন যারা আল্লাহ্‌র ফযলে প্রথম শ্রেণীর আনুগত্যকারী। একজন আমীর ছাড়া খলীফাতুল মসীহর নির্দেশনার বিরোধিতা করেছেন এমন কোন আমীর আমার জীবনে দেখি নি। এটি তার দুর্ভাগ্য ছিল যার ফলে তাকে জামা'তের সেবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়। আল্লাহ্‌র ফযলে আমীরগণ আত্মবিলীনতার প্রতীক হয়ে থাকেন।

আমীরের সম্মান ও মর্যাদার হিফাযত করা যুগ-খলীফার কর্তব্য। আপনারা শুনেন নি কিভাবে খোদাতা'লা নবীদের হিফাযত করেন? হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কত দাবী ও আস্থার সাথে বলেছেন, "তোমরা দেখছো না আমার পেছনে কে দাঁড়িয়ে আছে? তিনি কখনো আমাকে নিঃসহায় অবস্থায় রাখবেন না।" সুতরাং খলীফারাও এই একই সুন্নত পালন করবেন। নবীগণ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন আর খলীফাগণ নবীদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে থাকেন। আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, যতদিন পর্যন্ত যুগ-খলীফা কাউকে আমীর বানিয়ে রাখবেন ততদিন তিনি আমীরের হিফাযতের জন্য সদা প্রস্তুত থাকবেন। আমীরের উপর আক্রমণ চলবে আর খলীফা চুপচাপ বসে বসে দেখবেন—এ হতে পারে না। যে ব্যক্তি এ ধরণের কপটতাপূর্ণ ও নির্বোধ চিন্তা-ভাবনা রাখে আর বলে, আমি খলীফার মনোনীত আমীরের সাথে দ্বন্দ্ব রাখি কিন্তু সেই সাথে খলীফার পদযুগলে চুমু দেই তবে সে ব্যক্তি স্বীয় দাবীতে মিথ্যা। এগুলো সব শয়তানী ভাবনা-চিন্তা। যুগ-খলীফা এ ধরণের পদচুম্বনের উপর পদাঘাত করতে নারাজ (অর্থাৎ এই বাহ্যিক ভক্তির কোন মূল্য দেন না)। যতক্ষণ না খলীফার কাছে সাব্যস্ত করা হয় যে, আমীরকে বদলানোর সময় হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফা সব সময় আমীরের সমর্থনে দণ্ডায়মান থাকবেন।

জার্মানীর জামা'তে একথা বলাবলি হয় যে, আমীরের একটি পৃথক দল রয়েছে এবং আমাদের (অর্থাৎ ফিৎনাবাজদের) আরেকটি দল আছে। আমীর সাহেব যদি নিজের মতিগতি না বদলান, তো দু'টি দলের উৎপত্তি হবে। আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে, আহ্‌মদীয়া জামা'তে একটি দল এবং কেবল একটি দলই আছে আর সেটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র দল। আমীর সাহেব সেই দলেরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। এছাড়া যত দল রয়েছে সব শয়তানী দল, তাদের এই জামা'তে কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই আমীরের সামনে বড় বড় কথা বলা যেমন: আমরা সেই মহিলাদের জানি যাদের আপনি কথা শুনছেন, কোন্ দলটি আপনাকে সাহায্য করে যাচ্ছে আমরা খুব ভালই বুঝি—এ ধরণের কথাবার্তা প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং কোন ক্রমেই জামা'তে এগুলোকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না।

আমি (জার্মানীর) আমীর সাহেবকে ভালভাবে আশ্বস্ত করতে চাই, আপনি বাঘের মত নির্বিঘ্নে কাজ করে যান, যুগ-খলীফা আপনার সংগে আছে এবং সমস্ত জামা'তে আহ্‌মদীয়া আপনার সংগে আছে। জার্মানীর জামা'তও আপনার সংগে আছে এবং বিশ্বের ১২৬টি দেশের জামা'ত আপনার সংগে আছে। আর যার সমর্থন যুগ-খলীফা করবেন আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং তাঁর সমর্থন করবেন এবং চিরকাল করবেন। যারা বিদ্রোহ করবেন তাদের বিদ্রোহ চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে। ইতিপূর্বে বড় বড় লোক জন্ম নিয়েছিলেন এবং বড় বড় দাবী করে বলেছিল, "আমাদের দল বেশী ভারী", সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেই দল। তাদের সমস্ত সম্মান খেলাফতের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকার কারণে তারা তা লাভ করেছিল। আজ সে সম্মান কই? লাহোরী জামা'তের পরিণাম কি হয়েছিল আপনারা জানেন না? যারা সদর আঞ্জুমানের বড় বড় কর্মকর্তা ছিল তাদের দশা কি হয়েছে? খলীফা আউয়াল, যিনি বিনয়ের প্রতীক ছিলেন তিনি কিভাবে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন? আমিও আল্লাহ্‌র ফযলে বিনয়ের প্রতীক। কিন্তু যেখানে খোদার প্রতিষ্ঠিত নিযামের মান-মর্যাদার প্রশ্ন সেখানে আমি কোন ক্রমেই আমার মাথা নত করতে পারি না। কেউ কেউ আমাকে বলে, আপনি তো ভালবাসার সাগর। আমি তাদের বলে দিতে চাই, সাগরেও ঝড় উঠে! জেনে রাখবেন এই ভালবাসার সাগরে খোদার আত্মাভিমানের কারণে যে ঝড় উঠেছে সে ঝড়ের কবলে পড়ে সব ক'টি শয়তানী জাহাজ ডুবে যাবে। এই তুফানের মোকাবিলা করার সাধ্য কারও নেই।"

আমি আমীর সাহেবকে বলেছি, আমি জার্মানীর জামা'তের কাছে প্রত্যাশা রাখি তারা যেন আমীর সাহেবের পূর্ণ আনুগত্যের অঙ্গীকার করে। এবং পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মাধ্যমে আমাকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয় যে, "আমরা যারা আপনার বয়াত করেছি তাদের প্রত্যেকে এই আমীরের কেবল আনুগত্যই করব না বরং তাঁর পুরোপুরি সম্মান ও আদব করব। যারা আপনার মনোনীত আমীরের সাথে বিবাদ করবে আমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিবো অর্থাৎ তাদের কোন অস্তিত্বই থাকবে না।" এই নিশ্চিহ্ন করা শারীরিক

ভাবে নয় বরং এই অর্থে যে, তাদের আমিত্বকে সম্পূর্ণ বিফল ও ব্যর্থ করে ছাড়ব, তাদের অহংকারকে চিরতরে ভেঙ্গে দিবো। আর আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখি যে, জামা'ত অনুরূপই করবে।

আমি অন্য যে কোন ব্যক্তির তুলনায় আমার জামা'তকে ভাল জানি। আপনারা আমার হৃদয়ে বাস করেন এবং আমি আপনাদের হৃদয়ে বাস করি। আমরা একে অপরের ধরণধারণ ও চলন ভালভাবেই বুঝি। তাই আমি আপনাদের পক্ষ থেকে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে এই ঘোষণা দিচ্ছি যে, "আজ আপনার মনের যে আবেগ সেটি জার্মানীর জামা'তেরও আবেগ আর সারা বিশ্বের জামা'তেরও সেই একই ভাবাবেগ।"

সুতরাং আমিত্বপূর্ণ ও অহংকারী ফেৎনাবাজদের কাছ থেকে আপনাদের ভীত হওয়ার কি আছে? তারা আগেও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে নি আগামীতেও জামাতের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি আপনাদের এসব কথা বিস্তারিতভাবে এজন্যে বলেছি কেননা কিছু কিছু সাদাসিদে মানুষ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার আগেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায়। যখন এ ধরণের প্রকাশ্য মোকাবিলা হয় তখন তারা তওবাও করেন আর ফিরেও আসেন কিন্তু আহত হবার পর। গুটি কতক অভাগা ছাড়া এ ধরণের ফিৎনাবাজদের সাথে আর কেউ থাকে না। এদের সঙ্গীরা নিজেরাই এদেরকে ছেড়ে দেয়। বদরের যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে কুরআন করীমে এ বিষয়েও বিশদ বর্ণনা রয়েছে। ফিৎনার কোন ধরণ এমন নেই যে সম্বন্ধে কুরআন করীমে আমাদের সাবধান না করেছে।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের দায়িত্বাবলী পালন করার তৌফীক দান করুন। বর্তমানে আমাদের দায়িত্বাবলী সাধারণ অবস্থার চেয়ে অনেক বেশী। মনে রাখবেন আমরা নব শতাব্দীর শিরোভাগে অবস্থান করছি। আমাদেরকে সমন্বিতভাবে এই শতাব্দীর ইমাম মনোনীত করা হয়েছে। আজকের বিভ্রান্তি ও পদস্খলন আগামী ১০০ বছরকে প্রভাবান্বিত করবে। তাই বুঝে শুনে দৃঢ়তার সঙ্গে পদক্ষেপ নিন। জামা'তের ঐতিহ্যপূর্ণ নিয়ম-নীতিগুলো সংরক্ষণ করুন। যার 'আমিত্ব' মাথা চারা দিয়ে উঠে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিফল ও ব্যর্থ করে দেখান। আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হউন এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর শেখানো উচ্চমানের বিধান অনুযায়ী আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের তৌফীক দিন।

[হুযূর (আইঃ)-এর ৩০/৮/৯১ তারিখে খুৎবা অডিও ক্যাসেট থেকে অনূদিত]

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফিরিশ্‌তাগণ তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তা'লার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্য কর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।"

(কিশ্‌তি-এ নূহ্‌ পৃঃ ২৯)

চলো শান্তির পায়রা উড়াই

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

শান্তির পায়রা দিলাম ছাইড়া
কোথায় গেল! গেল বুঝি মইরা।
পায়রার সাথে ছিল না হৃদয়ের পরশ
ছিল আনুষ্ঠানিকতার সকল হরষ।
অনুরাগে হৃদয়ে হৃদয়ে ঘটিলে বাঁধন,
পায়রা তা-ই করে যাবে স্থাপন।
অনুরাগে থাকিলে কোন ছেদ
পায়রা বুঝিবে না কেন বাড়িছে বিচ্ছেদ।
চল আগে হৃদয়ের রোগ সরাই
তারপর শান্তির পায়রা উড়াই।

... ...

সালাম বলতে মুসলমান নয় কৃপণ
তাদের মাঝেও কেন হয় না শান্তি স্থাপন।
তারা করে খুনাখুনী, তৈল কূপে জ্বালায় আগুন,
এই কি মহানবী (সাঃ) এর উম্মতের গুণ!
হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে বলিলে সালাম
সফল হবেই এ পুণ্যময় কালাম।

২৩শে আশ্বিন, ১৩৯৮
৩রা অক্টোবর, ১৯৯১

"সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ) হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

জেহাদ বিল্ কুরআন

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

অর্থাৎ ধর্মে বল প্রয়োগ নেই। لا اكراه فى الدين ০

কেননা—قد تبين الرشد من الغى

সৎপথ ও ভ্রান্তি—এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। (২:২৫৭)

এই আয়াতের পূর্ববর্তী কিছু আয়াতে বলা হয়েছে যে, ধর্মের প্রয়োজনে আত্ম দান করা হবে। এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এথেকে কেউ এই ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে যে, আল্লাহ্তা'লা বুঝি ইসলাম প্রচারের জন্য যুদ্ধ করার বা বলপ্রয়োগ করার অনুমতি দান করেছেন। আলোচ্য এই আয়াতে এইরূপ ভুল বুঝাবুঝির মুলোৎপাটন করা হয়েছে। এবং পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, ধর্মে জবরদস্তি নেই,—মুসলমানরা যেন অমুসলমানদের উপরে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বল প্রয়োগ না করে। তাছাড়া, এইরূপ বল প্রয়োগের কোন প্রয়োজনীয়তাও নেই। কেননা, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। ইসলাম দীপ্যমান সত্যরূপে বিরাজমান হয়েছে! অতএব, ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদের জন্য কোন নিয়মিত বা বেতনভোগী সেনাবাহিনী ছিল না। হযরত রসূলে পাক (সাঃ) কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনার সময়ে সাহাবাগণের প্রতি আহ্বান জানাতেন স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে যুদ্ধে যোগদান করার জন্য। যাঁরা স্বেচ্ছায় যোগদান করতেন তাঁদেরকে নিয়েই গঠিত হতো সেনাবাহিনী সাময়িকভাবে। স্বেচ্ছায় যোগদানকারীরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ-সম্ভার সংগ্রহ করে নিতেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা স্বচ্ছল ছিলেন তাঁরা অস্বচ্ছল সাহাবীগণের জন্য অস্ত্র-পাতি ও রসদ-সম্ভার জোগাড় করে দিতেন। এ ক্ষেতে অনেক সময় আঁ-হযরত (সাঃ) নিজেও যথাসম্ভব অন্যকে সাহায্য সহায়তা করতেন।

সেনাবাহিনী যুদ্ধে পাঠাবার প্রাক্কালে আঁ-হযরত (সাঃ) সেনাপতি বা দলীয় কমাণ্ডারকে নির্দেশ দিতেন যে, তারা যেন শত্রুপক্ষকে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানায়। এই আহ্বানে সাড়া দিলে তাদেরকে মদীনায় হিজরত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু হিজরত করতে রাজী না হয় তাহলে তাদেরকে তাদের আবাসস্থলে শান্তিতে বসবাস করতে দিতে হবে। শত্রুগণ যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তবে তাদেরকে যুদ্ধ না করার জন্য এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এই আমন্ত্রণও যদি তারা গ্রহণ না করে, এই সব প্রস্তাবই যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে, তবে সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে উপায় থাকবে না এবং যুদ্ধই করতে হবে। যুদ্ধযাত্রার প্রারম্ভে তিনি (সাঃ) সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বলতেন,

হে মুসলমানরা! তোমরা আল্লাহ্‌র নামে যাত্রা শুরু কর এবং তোমরা যুদ্ধ করবে আল্লাহ্‌রই ওয়াস্তে। তোমরা যুদ্ধলব্ধ মালামালের ব্যাপারে প্রতারণা করবে না। শত্রুর সঙ্গেও প্রতারণা করবে না। শত্রুর মৃতদেহ বিকৃত করবে না। নারী, শিশু, সাধু-সন্ন্যাসী, পাদ্রী-পুরোহিত এবং বৃদ্ধদেরকে হত্যা করবে না। সর্বদা জনসাধারণের উন্নতি সাধনের চেষ্টা চালাবে তাদের সঙ্গে সদাচরণ করবে, আল্লাহ্‌ সদাশয়দেরকে ভালবাসেন।'.....

এইসঙ্গে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর আমলে সৈন্যদের প্রতি নসীহত করে আরও বলতেন :

যারা খোদার কাজে জীবন উৎসর্গ করেছে তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দিবে এবং যার উদ্দেশ্যে তারা আত্মোৎসর্গীত তাকেও ছাড়বে। ফলবান বৃক্ষ কাটবে না। জনপদ ধ্বংস করবে না।

অন্যদের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি হয় এমন স্থানে সেনাছাউনী স্থাপন করতে নিষেধ করতেন রসূলুল্লাহ (সাঃ)। তিনি রাস্তা দিয়ে এমনভাবে মার্চ করে যেতে বলতেন যাতে গোটা রাস্তা বন্ধ হয়ে না যায়। কোন মানুষের চেহারায় বা মুখমণ্ডলে আঘাত করা নিষিদ্ধ ছিল। এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য কড়া নির্দেশ দিতেন আঁ-হযরত (সাঃ)।

নিয়মিত যুদ্ধ ছাড়া কাউকে যুদ্ধবন্দী করা নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে কিংবা দয়াপরবশ হয়ে মুক্তি দেয়া হতো। তাদের প্রতি সুন্দর ও সদাচরণ করা হতো।

মুসলিম সৈন্যদের জন্য লুঠতরাজ করা বারণ ছিল। কোন শত্রু সৈন্য যদি যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও ইসলাম কবুল করতো তাকেও হত্যা করা নিষিদ্ধ ছিল।

একবার এক জেহাদের ময়দানে উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর সঙ্গে এক ব্যক্তির লড়াই হচ্ছিল। উসামা বিন যায়েদ লোকটিকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং হত্যা করতে উদ্যত হন। এমন সময় অবিশ্বাসী লোকটি কলেমা শাহাদাৎ পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। তথাপি উসামা তাকে হত্যা করেন। ঘটনাটি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কাছে রিপোর্ট করা হলে তিনি উসামাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, সে ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তুমি তাকে কেন হত্যা করলে? উত্তরে উসামা বলেছিলেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ! সে তো প্রাণের ভয়ে ইসলাম কবুল করেছিল?' আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছিলেন—'তুমি কি তার হৃদয় ফেঁড়ে দেখেছিলে যে, সে সত্যসত্যই ইসলাম গ্রহণ করেছিল না প্রাণের ভয়ে করেছিল?' রসূলে পাক (সাঃ) অতঃপর বলতে লাগলেন, কাল হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌র সামনে তুমি কি করে তোমার কাজকে সঠিক সাব্যস্ত করবে?...যখন কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তখন তুমি কি করবে?' আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এইরূপ ভয়ানক অসন্তুষ্টি দেখে উসামা ভীষণ ঘাবড়িয়ে যান এবং আঁ-হযরত (সাঃ) তখন ঐ কথাই বার বার বলছিলেন যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' যখন তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে...। উসামা পরে বলেছিলেন, হায়! আমি যদি এই ঘটনার পরে ইসলাম গ্রহণ করতাম'!

এই ঘটনা এবং আরও নানা ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বল পূর্বক মুসলমান বানানো ইসলামী জেহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এবং বলপূর্বক কাউকে মুসলমান করাও হয় নি, কোন যুদ্ধবন্দীকেও না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমানের তরবারীর ভয়ে সেদিন কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নি, বরং মক্কা বাসী অমুসলিমদের তরবারির প্রকাশ্য ভয় থাকা সত্বেও লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে সময়কার ইতিহাসের আরও একটি বিস্ময়কর দিক হচ্ছে, তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলাকালীন সময়ে যত লোক ইসলামের তবলীগ শুনেছে এবং মুসলমান হয়েছে তার চেয়ে বহু বহু গুণ বেশী লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে শান্তির সময়ে। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন সময় তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই সন্ধি ছিল বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটি দুর্বলতার দলীল। এই সন্ধিকে তাদের বিজয় বলে ঘোষণা করেছিল শত্রুপক্ষ। কিন্তু কুরআন মজীদে একে প্রকাশ্য বিজয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বাস্তবে ঘটেছিল তাই। কেননা, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওয়াতের দাবী থেকে নিয়ে হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত বিপদ-আপদ ও অশান্তির প্রায় উনিশ বৎসর কালের মধ্যে যত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তার চাইতে অনেক অনেক গুণে বেশী সংখ্যক মানুষ ইসলাম কবুল করেছিলে সন্ধির দুই বৎসর সময়কালে। এই সন্ধির পূর্বেকার কোন যুদ্ধে যোগদানকারী মুসলমানের সংখ্যা তিন হাজারের অধিক ছিল না। কিন্তু মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম সেনাবাহিনীতে ছিলেন দশ হাজার পবিত্রাত্মা ব্যক্তি।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওয়াতের দাবী থেকে হিজরত পর্যন্ত দীর্ঘ তের বৎসর কাল ছিল একতরফাভাবে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন ভোগের সময়।

হিজরত থেকে হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত সময়কালও ছিল অত্যাচার ও দুর্ভোগ-দুর্যোগের কাল। এই সময়ে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন আঁ-হযরত (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। ঈমান ও আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধের অনুমতি পেলেও তাঁদের না ছিল লোক-বল, না অর্থবল, না অস্ত্রবল। খোদার সাহায্যেই জয়লাভ করেছিলেন তাঁরা। ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই সময়টাতে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে অল্প সংখ্যায়। অথচ সন্ধির সময়কালে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে ব্যাপকভাবে। এথেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, ধর্মযুদ্ধগুলো ইসলাম প্রসারে সহায়ক হয়নি, বরং ক্ষতির কারণ হয়েছিল। অন্য কথায়, ইসলামের প্রসার তরবারির দ্বারা ঘটেনি, ঘটেছিল তবলীগ বা প্রচারের দ্বারা। অথচ ইসলামের ইতিহাসের এই প্রকাশ্য সত্যকে বিকৃত করে, আঁ-হযরত (সাঃ) এবং ইসলামের দুশমনরা বলে থাকে যে, ইসলাম তলস্ত্র বা তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে। তারা বলে যে, মুহাম্মদ ও তাঁর লোকেরা এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে কুরআন নিয়ে ইসলাম প্রচার করতো। ইসলামের দুশমনদের এই সব ভ্রান্ত ও কলুষিত প্রচারের কথা প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু কোন কোন আলেমও অনুরূপ কথা বলেন, বরং তার চাইতেও ভয়ানক মিথ্যা বলে থাকেন। কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। যেমন: জামাতে ইসলামী দলের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদী সাহেব লিখেছেন:

'রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তের বৎসর পর্যন্ত আরবকে ইসলামের আহ্বান জানাতে থাকেন। মানুষকে বুঝাবার জন্য যত প্রকার উৎকৃষ্ট পন্থা আছে তা অবলম্বন করেন। যুক্তি প্রমাণ দেন, বাগ্মিতাপূর্ণ তেজস্বী ভাষায় শিক্ষা দেন। তিনি আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হতে বিস্ময়কর মোযেজা প্রদর্শন করেন। তিনি সদাচার ও স্বীয় পবিত্র জীবন দ্বারা পুণ্যের সেরা আদর্শও পেশ করেন। তিনি সত্য প্রকাশ ও স্থাপনের জন্য উপযোগী কোন উপায় বাদ দেন নাই। কিন্তু তাঁর সত্যতা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্বজাতি তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। .....ওয়াজ-নসিহত ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের আহ্বায়ক যখন তরবারী হাতে নিলেন.....তখন মানুষের মন থেকে ক্রমে ক্রমে পাপ ও দুষ্কৃতির কালিমা দুর হতে লাগল। তাদের স্বভাব থেকে আপনি ক্লেদ দূর হয়ে গেল।.....

'আরবের ন্যায় অন্য দেশগুলিও এত দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করলো যে, এক শতাব্দীর মধ্যে এক চতুর্থাংশ পৃথিবী মুসলমান হয়ে গেল। এর একই কারণ ছিল যে, ইসলামের তরবারি হৃদয়ের সকল আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে দিল।.....''

(আল্ জিহাদ ফিল ইসলাম, ১৩৭—১৩৮ পৃঃ)

ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র রসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে এত বিষাক্ত উক্তি ইতোপূর্বে আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অন্যেরা তো একথা বলেছে ঠিক যে, ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে, কিন্তু এমন কদর্য কথা কেউ বলেনি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তরবারি দিয়ে মানব হৃদয়ের পাপ ও কালিমা সাফ করেছেন। মৌলানা কি এই সত্য বুঝতে পারেন নি যে, তরবারির দ্বারা মানুষের মুণ্ডু কেটে দূরে ফেলা গেলেও মানুষের হৃদয় থেকে পাপ ও কালিমা দূর করা যায় না? তরবারি দ্বারা হৃদয় পবিত্র করা যায়, পরিবর্তন করা যায়, এমন মনস্তত্ব বিরোধী ইতর ও অসত্য একটা কথা তিনি কি করে সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা মানুষ ও পবিত্র সত্তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলেন, তা ভাবতেও লাগে আফসোস যে, এই ভীষণ নাপাক কথাগুলো নিঃসৃত হয়েছে মুসলিম সমাজের গণ্যমান্য এক আলেমের মুখ থেকে। তবে,—

এর বিপরীতে সান্ত্বনার কথা এই যে, অধুনা অনেক অমুসলিম নিরপেক্ষ চিন্তাবিদ ও ঐতিহাসিক এই জাতীয় জঘন্য উক্তির অসত্যতা সম্পর্কে কথা বলছেন। তারা এই ঐতিহাসিক সত্য দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করছেন যে, ইসলাম বিজয় লাভ করেছিল তার শিক্ষার সৌন্দর্যের গুণে, তার প্রবর্তক মহান রসূলের অতুল চারিত্রিক সৌন্দর্যের বলে, তরবারি বা অস্ত্রের বলে নয়। যেমন:

'বিরুদ্ধবাদীগণ অন্ধ। তারা দেখতে পায় না যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দয়া ও সৌজন্য, বন্ধুত্ব ও ক্ষমাই ছিল তাঁর তরবারি যা বিরুদ্ধাচারীদেরকে পরাভূত করতো সম্পূর্ণরূপে। এই তরবারি তাদের হৃদয়কে সাফ করে আয়নার মত উজ্জ্বল করে দিত। লৌহ-নির্মিত তরবারি অপেক্ষা এর কাটবার ক্ষমতা ভীষণ এবং এ অতীব ধারাল।'

(পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্র দেব শর্মা শাস্ত্রী : দুনিয়া কা হাদীয়ে আযম গায়রেঁা কি নযর মে মকবুল পৃঃ ৬১)। দ্রঃ 'ধর্মের নামে রক্তপাত' : হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)।

"কিন্তু মদীনায় থেকে মুহাম্মদ সাহেব (সাঃ) তাদের ভেতরে যাদুর বিদ্যুৎ ভরে দিলেন। এ এমন এক যাদু যা মানুষকে দেবতায় পরিণত করে।... ...ইসলাম শুধু তরবারির দ্বারা বিস্তার লাভ করেছে — এ কথা ভ্রান্ত বরং ঐতিহাসিক সত্য এটাই যে, ইসলাম বিস্তারের জন্য কখনই তরবারি ধারণ করা হয়নি। ধর্ম যদি তরবারির দ্বারাই বিস্তার লাভ করা সম্ভব, তাহলে আজ কেউ তা দেখায়ে দিক।"—

(প্রফেসর রাম দেব : বরগুজিদা রসুল গাইরেঁা মে মকবুল, পৃঃ ২৪)।

"বস্তুতঃ, তাদের সকল যুক্তিই পণ্ড হয়ে যায়, যারা মনে করে যে, জেহাদের উদ্দেশ্য ছিল তরবারির দ্বারা ইসলামের বিস্তার। কারণ এর বিরুদ্ধে সূরা হজ্জে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, জেহাদের উদ্দেশ্য মসজিদ, গীর্জা, মঠ ও আশ্রমকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা।"—

(ডঃ ডি, ডাবলিউ লাইটজ : এশিয়াটিক কোয়ার্টারলি রিভিউ : অক্টোবর ১৮৮৬)

"No other religion in history spread so radily as Islam. The West has widly believed that this surge of religion was made possible by the sword. But no modern scholar accepts that idea, and the Quran is explicit in support of freedom of conscience." James Michener : The Misunderstood Religion, Readers Digest, June 1955, p. 88 ; See—'Muhammad : Seal of the Prophets : (Sir) Muhammad Zafrulla Khan.)

"History makes it clear, however, that the legend of fanatical muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conqurered races, is one of the most fantastically absurd myths that historians have ever repeated."

(De L. O'Leary : Islam at the crossroads, P-8)

স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (রাঃ) লিখেছেন :

"Sir Thomas W. Arnold, a well-known and highly respected orientalist, at one time professor of Arabic in the University of London, made a thorough research into this question and in his outstanding work, 'The preaching of Islam', first Published in 1896, established beyond a doubt that sword had nothing to do with the spread of Islam." (Ibid).

এই জাতীয় উদ্ধৃতি অনেক দেওয়া যায়। অনেক মুক্তচিত্ত নিরপেক্ষ অমুসলিম খ্যাতনামা চিন্তাবিদই এ সত্য প্রমাণিত করেছেন যে, ইসলামের বিস্তারে তরবারির কোন ভূমিকাই ছিল না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঐতিহাসিক অকাট্য এই সত্যের বিরুদ্ধে মৌলানা মওদুদী লিখেছেন :

'ইসলামের তরবারি হৃদয়ের সকল আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে দিল।'

তিনি আরও লিখেছেন :

"আহ্বানে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়ার অপেক্ষা না করে তিনি (সাঃ) রোমান সম্রাটের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।" (দ্রষ্টব্যঃ ধর্মের নামে রক্তপাত)। পাঠক! মৌদুদী সাহেবের এই উক্তিগুলোর সঙ্গে ইসলাম ও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রকাশ্য দুশমনদের কথা মিলিয়ে পড়ুন। হেন্‌রী কুপার লিখেছেন :

'তাঁর নবুওয়াতের ত্রয়োদশ সনে ঘোষণা করলেন যে, খোদা তাঁকে শুধু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধেরই অনুমতি দেন নি, বরং তাঁর ধর্ম তরবারির বলে বিস্তার করবারও অনুমতি দিয়েছেন।'
(আরব জাতির স্পেনের ইতিহাস, পৃঃ ৩৯, দ্রঃ : প্রাগুক্ত)।

ডাঃ স্প্রেঙ্গার লিখেছেন :

'এখন পয়গম্বর বিপ্লব থামাবার জন্য তাঁর শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করার আইন খোদার নামে প্রকাশ করলেন এবং এখন থেকে তাঁর খুনী ধর্মের নীতি হল যুদ্ধং দেহী শ্লোগান।'—
(দ্রঃ : প্রাগুক্ত)।

পাদ্রী ফাণ্ডর লিখেছেন :

'এ যাবৎ হযরত মুহাম্মদ তের বৎসর ধরে নম্র ও কৃপাপূর্ণ পন্থায় তাঁর ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন.....এজন্য এখন থেকে আঁ-হযরত 'আন্‌ নবী বিস সাইফ' (তল্‌ওয়ারধারী নবী) বলে অভিহিত হলেন। অর্থাৎ 'অসিচালক নবী' হয়ে পড়লেন। এখন থেকে ইসলামের সব চাইতে মজবুত ও কার্যকারী দলীল হলো তলোয়ার।' (মিযানুল হক, পৃঃ ৪৬৮)।
(দ্রঃ : প্রাগুক্ত)

ইসলামের এই শ্রেণীর প্রকাশ্য দুশমনদের উত্তরসূরী হিসেবে কেউ যদি মৌলানা মৌদুদীকে চিহ্নিত করেন, তবে কি তাকে বড় একটা দোষারোপ করা যাবে? মৌলানার অনুসারীরা কি বিষয়টা একবার ভেবে দেখবেন? আমরা তাদের চিন্তার সংশোধন কামনা করি। আল্লাহ্‌ তাদের সুমতি দিন। (ক্রমশঃ)

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, কিন্তু পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহাপরাক্রমশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশিত করিবেন।" হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)

একটি সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

কার্ল মার্কস স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন এক সমাজ ব্যবস্থার যেখানে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে না কোন শ্রেণীও থাকবে না। গঠিত হবে একটি সচেতন সমাজ যেখানে সবাই সাধ্যমত শ্রম দিবে। অর্জিত সব সম্পদের মালিক হবে সমাজ। আর তা থেকে সবাইকে প্রয়োজন মত রেশন দেয়া হবে। ব্যক্তি মালিকানা না থাকলে সেখানে কোন সংঘাত জন্ম নিবে না। ব্যক্তি বা গণ নয় সমাজ হবে ঐ স্বপ্ন রাজ্যের মূল। স্বপ্নটি নিঃসন্দেহে একটি সুখ স্বপ্ন। এই স্বপ্নের নাম কমিউনিজম। এই স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে জন্ম নিল সমাজবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন। প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারার এক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল লেনিনের নেতৃত্বে।

পুঁজিবাদ আর স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের কবল থেকে শ্রমজীবি মানুষ মুক্ত হয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় নূতন উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হল না। ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, "মানুষ কেবল মাটিতে বাঁচবে না।" হ্যাঁ, মানুষের খাদ্য কেবল রুটি বা ভাতই নয়। তার জন্য প্রয়োজন মন ও আত্মার খোরাকও। কিন্তু একজন কমিউনিষ্ট বলেন, 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসান রুটি:" ওদের মতে টাকাই সব। বস্তুই জীবনের একমাত্র কাম্য। কমিউনিষ্ট কবি বলছেন,—

জানি, তবে জীবনে কখনো ঈশ্বর দেখিনি কি না,
তাই ঠিক বুঝতে পারি না তার মূল্য কতখানি
দিনের কাজের শেষে একটি আধুলী পাই হাতে
ভালবেসে পূজো করি তাকে ঈশ্বর ভাবি রাতে।

এদের মতে অজ্ঞানের অপর নাম ঈশ্বর (নতুন মানব সমাজ, ৩১ পৃঃ)। বস্তুবাদে বিশ্বাসীরা পুরাপুরি নাস্তিক এবং ধর্ম বিরোধী (রিলিজিয়ান, লেলিনকৃত)। এরা বলেন, "নিয়মিত অভুক্ত, নিরক্ষর, নিরাশ্রয় এবং ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি তত্ত্বীয় চিন্তা করে না। নিয়মিত অভুক্ত ব্যক্তির কাছে আপ্তবাণী আসার দৃষ্টান্তও নেই। অভুক্ত, ভুখা নাঙ্গা কোন কোন ব্যক্তির পয়গম্বর বা অবতার হওয়ার কোন কাহিনী আমরা ইতিহাসে পাঠ করি না। ইহুদী পয়গম-স্বরদের প্রায় সকলেই ছিলেন রাজা অথবা উপজাতীয় প্রধান (আরেক ভুবন সোভিয়েত ইউনিয়ন, আবু জাফর শামসুদ্দীন, ৪৮ পৃঃ)। আরেকজন কমিউনিষ্ট মহাপণ্ডিত বলেছেন, "মোজেস অথবা যীশু.....না জানি, কত মানুষকে তাহারা দুঃখ দিয়াছিলেন...না জানি কত দাসদাসী তাহারা ক্রয় করিয়া তাহাদের আজীবন পশুর ন্যায় পরিশ্রম করাইয়া ছিলেন (নতুন মানব সমাজ)।

কমিউনিষ্ট পণ্ডিতদ্বয় বলেছেন, অভুক্ত ব্যক্তির কাছে নাকি আপ্তবাণী আসে না। অভুক্ত ভুখা ব্যক্তি নাকি পয়গম্বর হন না। ইহুদী পয়গম্বররা নাকি সবাই রাজা ছিলেন। মূসা এবং ঈসা নাকি বহু দাস দাসী খরিদ করে তাদের সঙ্গে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়েছেন। এসব নাকি তারা ইতিহাসে পাঠ করেছেন। যাক, আমরা ইতিহাস পাঠকদের কাছে এসব কথার সত্যাসত্য যাচাইয়ের ভার ছেড়ে দিলাম। আমরা জানি ইসলামের মহান নবী দিনের পর দিন অভুক্ত থাকতেন। অভাব অনটন ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। মূসা ছিলেন ফেরাউনের দাস বংশের সন্তান। আর ঈসা নবী স্বয়ং বলেন, "পাখীরও বাসা আছে, শৃগালেরও গর্ত আছে কিন্তু মনুষ্য পুত্রের (ঈসার) মাথা রাখার স্থান নাই (মথি, ৮:২০)।

কমিউনিষ্টরা যদি শুধু গরীবের খাদ্যের জন্য চেষ্টা করে যেত তাহলে হয়ত কিছুটা সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হত। কিন্তু তারা তা না করে ধর্মের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগল। লেনিন বললেন, "এমন সব কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে যার ফলে ধর্ম আপনা আপনি আউড়িয়ে মারা যাবে (ধর্ম, ২৩ পৃঃ)। "মার্কস পন্থীকে অবশ্যই বস্তুবাদী অর্থাৎ ধর্মের শত্রু স্থানীয় হতে হবে (ঐ, ৩০ পৃঃ)। রাশিয়া সম্বন্ধে একজন পণ্ডিত বলেছিলেন, "আজিকার এই বৃদ্ধ বৃদ্ধার মৃত্যুর পরে রাশিয়ায় কেহ ঈশ্বরের নাম লইবে না (নতুন মানব সমাজ, ২৭ পৃঃ)। চীন সম্বন্ধে একজন লেখক বলেছিলেন, "পরিস্থিতির চাপে ধর্মের স্বাভাবিক মৃত্যু এমনিতেই হবে (গণচীনের কৃষ্টি বিপ্লব, ৩৯ পৃঃ)। অবশ্য এদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি। রাশিয়া এবং চীনে ধর্মের মৃত্যু হয় নি। বরং রাশিয়ায় মৃত্যু হয়েছে কমিউনিজমের। চীন হাত মিলিয়েছে পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে। কল্পনার শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়া তো দূরের কথা আজ কমিউনিজম শুধু কোন কোন দেশের পার্টির নামের সঙ্গে স্মৃতি হয়ে আছে। জনৈক প্রাক্তন কমিউনিষ্ট বলেন, "বস্তুতঃ আজকাল কোন লোকই কমিউনিজমে বিশ্বাস করে না (মিলোভান জিলামের উক্তি, ইত্তেফাক, ১৮ই আষাঢ়, ১৩৮৬)। বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি প্রধান বলেছেন, ১৯৫৬ সালের পর রাশিয়ায় প্রকৃত কমিউনিষ্ট বিলুপ্ত হয় (আজকের কাগজ ২/৯/৯১)।

রাশিয়ায় তথা সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে আজ ভয়াবহ খাদ্যাভাব। সে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছে পুঁজিবাদী জগতের কাছে। কমিউনিষ্ট শাসনের বিগত ৭৪ বৎসরের ব্যর্থতা আজ ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে তছনছ করে দিয়েছে। কমিউনিষ্ট জার্মানী দেয়াল ভেঙ্গে মিলিত হয়েছে পুঁজিবাদী জার্মানীর সঙ্গে।

কয়েক বৎসর আগে প্রখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী লেখক প্রবোধ সান্যালকে রাশিয়ার উপর কিছু লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে নেয়া হয়েছিল। এজন্য তাকে হাজার হাজার রুবল দেয়া হয়েছে (রাশিয়ার ডায়েরী ৫৯২ পৃঃ)। আমরা তার পুস্তক রাশিয়ার ডায়েরী থেকে ওখানকার কিছু চিত্র অঙ্কিত করছি। "শ্রেণীহীন সমাজ বলতে যে একটি

বিশেষ সংজ্ঞা মনে মনে লালন করে এসেছি, এখানে এসে চারদিক দেখে শুনে সেই ধারণার ঈষৎ ব্যতিক্রম ঘটল। রাস্তায় রাস্তায় সেই একই ঝাড়ুদার কাজ করছে..... অবস্থাপন্নরা ছুটিয়ে চলেছে প্রাইভেট কার, সেই গরীব গৃহস্থরা বাজারের পুঁটলি ঝুলিয়ে ধীর গতিতে রাস্তা পেরিয়ে চলেছে (১৩ পৃঃ)। রাস্তাঘাট আজও অনেকাংশে মধ্যযুগীয় চেহারা নিয়ে বালু কাঁকর পাথরে আকীর্ণ (৪০ পৃঃ)। ওরা কোট প্যান্ট গার্ডেন পরে, আমরা পরি ধুতি, তফাৎ এইটুকু। এই ধরণের পরিবার কলিকাতায় হাজার হাজার (৫৫ পৃঃ)। ভিখারী এদেশে নেই বলেই এতদিন জানতাম। কিন্তু সেটি সত্য নয় (১০৩ পৃঃ)। একে একে অনেকগুলো ভিখারী দেখলুম (৪৩৫ পৃঃ)। হাজার হাজার গ্রামে জলাভাব, লক্ষ লক্ষ লোকের আশ্রয়াভাব (২৯০ পৃঃ)। মস্কোর এত কাছে এমন একটি দৈন্য দশা ঠিক আশা করি নি।...অফিসের সামনে বড় রাস্তায় উঠে আসবার পথটা জল কাদায় ব্যাড় ব্যাড় করছিল, আমরা জুতো এবং পোষাক বাঁচিয়ে কোনও মতে পেরিয়ে এলুম বহু ক্ষেত্রেই পথ-ঘাট এখনও তৈরী হয়নি (২০৯ পৃঃ)। নিয়মিত স্নানাদির অভাব, পায়খানার অব্যবস্থা, একই রান্না ঘরে পাঁচটা পরিবার একই শোবার ঘরে সাতজন (২১০ পৃঃ)। পল্লী গ্রামের রেল ষ্টেশনের প্লাট ফরমে দেখেছি ছাদ ঢাকা নেই,—জীর্ণ ছিন্ন পোষাকে যেখানে মেয়ে পুরুষের দল গুড়ের কলসীর মতো বসে রয়েছে, কিংবা যারা ভিড় করেছে যাত্রী শালায়, ময়লা চেহারায় ময়লা পোষাকে ময়লা রুটি বার করে যারা কামড় দিচ্ছে।.....হয়ত ওরা আজও কমিউনিজম বুঝে নি (৪৯৭ পৃঃ)। যৌন চরিত্রের স্খলন আছে বহু মেয়ে পুরুষের জীবনে (২৬০ পৃঃ)। একজন স্ত্রী যদি এসে তার স্বামীকে ডেকে হঠাৎ বলে, দেখো, আমার এই দ্বিতীয় সন্তানটি তোমার নয় অমুকের তাহলে স্বামী ছুটে গিয়ে ছুরি কাটারি খোঁজে না (২৮৩ পৃঃ)। দশ মিনিট লাগে বিবাহ করতে এবং দশ মিনিট লাগে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে (৫৪৯ পৃঃ)। এ কথা জনৈক কমিউনিষ্টও এভাবে স্বীকার করেছেন, স্বেচ্ছায় স্বামী স্ত্রী রূপে বসবাসের ফলে প্রসূত সন্তান মাত্রই বৈধ সন্তান, সে দেশে জৈব ধর্ম পালনের ফল—বৈধ বা অবৈধ কোনটাই নয় (আরেক ভুবন সোভিয়েত ইউনিয়ন, ৭৫ পৃঃ)। টাকা কড়ি ব্যয় করতে পারলে বড় বড় হোটেলে দেহ পসারিনীও নাকি মেলে (৭৬ পৃঃ)। মাটির দেয়ালের ঘরবাড়ী (৯২ পৃঃ)। এই হল 'স্বর্গরাজ্য' সোভিয়েত ইউনিয়নের রূপ। লৌহ যবনিকার অন্তরালে থাকায় এতদিন এইরূপ মুক্ত জগৎ দেখতে পায় নি। গ্লাসনস্থ এবং পেরেস্ত্রৈকার ফলে ওরা দেখেছে মুক্ত বিশ্বকে আর আমরা দেখছি তাদের প্রকৃত অবস্থাকে। রাজতন্ত্রের আওতায় থেকে জাপান কি করে উন্নতি করল? এসব বিষয় ভেবে দেখতে হবে। শুধু 'ইজম' 'ইজম' করলেই উন্নতি করা যায় না। উন্নতি করতে হলে চাই মুক্ত পরিবেশ এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞান। মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলে সভ্যতা বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারে না।

(অবশিষ্টাংশ ৩৮ পাতায় দেখুন)

সংবাদ

প্রেসিডেন্ট সম্মেলন '৯১

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্ আগামী ৭ ও ৮ই নভেম্বর '৯১ সালানা ইজতেমা করতে যাচ্ছে। এ ইজতেমা চলাকালীন সময়ে অর্থাৎ ৮ই নভেম্বর রোজ শুক্রবার প্রেসিডেন্ট সম্মেলন '৯১ অনুষ্ঠিত হবে। ইনশাল্লাহ। সুতরাং সকল জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে অবশ্যই ঐ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার এবং আসার সময় নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে:

(১) ১৯৯১—৯২ সনের চাঁদার বাজেট ও বর্তমান সময় পর্যন্ত আদায়ের অবস্থা।

(২) আপনার জামাতে মসজিদ ও মিশন হাউজের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে কার্যক্রম সম্বন্ধে বিস্তারিত একটি রিপোর্ট। আশা করি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এ সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

তাহরীকে জাদীদের চাঁদার সময় বর্দ্ধিত

আগামী ৩১শে অক্টোবর তাহরীকে জাদীদের বছর শেষ হতে যাচ্ছে। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমোদনক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, যে সমস্ত ওয়াদাকারী ৭ই নভেম্বর '৯১-এর মধ্যে এ চাঁদা আদায় করে দেবেন তাদেরকেও ১৯৯০-৯১ সনের মধ্যে চাঁদা আদায়কারী বলে গণ্য করা হবে।

এ, কে, রেজাউল করীম
সচিব (অর্থ)

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জামাতগুলোতে অতি শান ও শওকতের সাথে মহান সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্তা'লার অশেষ ফযল ও করমে এ বছর অতি আনন্দ ও গাম্ভীর্যের সাথে শহরের জামাতগুলো ছাড়া বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জামাতগুলোতেও শান ও শওকতপূর্ণ সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আমাদের প্রিয় নবী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে জামা'তের বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রেখেছেন এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, বর্তমান ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বিশ্বে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতিরেকে বিশ্ব মানবতার মুক্তি অলিক কল্পনা। কোন কোন সভায় গয়ের জামা'ত ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাইয়েরাও উপস্থিত ছিলেন বক্তা ও শ্রোতা হিসেবে। এ পর্যন্ত যে সব জামা'ত থেকে রিপোর্ট এসেছে তাদের নাম নিম্নে বর্ণিত হলো।

অনিবার্য কারণে আমরা বিস্তারিত খবর পরিবেশন করতে পারছি না বিধায় দুঃখিত। আল্লাহ্‌তা'লা সকলের প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন এবং তাদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, চুয়াডাঙ্গা, দোহাণ্ডা, নাসেরাবাদ, খুলনা, ভাতগাঁও, শাহবাজপুর, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌, সুন্দরবন, শ্যামপুর, তেবাড়িয়া, উথলী, কুকুয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, ক্রোড়া তাহেরাবাদ, রাজশাহী, বগুড়া, কুমিল্লা, ঘাটুরা, কাফুরিয়া, সৈয়দপুর ও মাহিগঞ্জ।

আনসারুল্লাহ্‌র খবর

মজলিসে আনসারুল্লাহ ঢাকা

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে গত ১৯/৯/৯১ ও ২০/৯/৯১ তারিখে ঢাকা মজলিসে আনসারুল্লাহর ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্‌।

১৯/৯/৯১ তারিখ রাত্র ৯ ঘটিকা হইতে প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়। নায়েব সদর জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেবের উপস্থিতিতে ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। ইজতেমায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পুরস্কার ও সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব, যয়ীমে আলার ভাষণ দেন জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ। বিভিন্ন বক্তাগণের বক্তব্য বিষয় ছিল—ইসলামের অর্থনীতি, নারীর পর্দা ও ইসলামী দুনিয়া, আনাসারুল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য, উসওয়ায়ে হাসানা, যথাক্রমে মাওলানা আবদুল আওয়াল খান চৌধুরী সদর মুরব্বী, জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী এবং সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ বাংলাদেশ জনাব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী। সভাপতি পুরস্কার বিতরণের পর তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী,
সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি

সুন্দরবন মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র একাদশ বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত

বিগত ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ ইং তারিখে সুন্দরবন মজলিসে আনসারুল্লাহর একাদশ বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযল ও রহমতে সুসম্পন্ন হইয়াছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

২১/৯/৯১ দিবাগত রাত্রি তাহাজ্জুদ নামাযের মধ্য দিয়া ইজতেমার কার্যসূচী শুরু হয়। মজলিসের প্রায় ৪০ জন সদস্য ইজতেমায় যোগদান করেন।

বিভাগীয় নাযেমের সমাপ্তি ভাষণ এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমের ইজতেমার কার্যসূচীর সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ আবদুস সাদেক,
মজলিস আনসারুল্লহ, সুন্দরবন

খোদ্দামের সংবাদ

নাসেরাবাদ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লহ্‌তা'লার অশেষ ফযল ও করমে গত ২রা অক্টোবর '৯১ ইং তারিখে নাসেরাবাদ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা স্থানীয় মসজিদে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে সুসম্পন্ন হয়। এই ইজতেমাতে প্রায় ৪৫ জন খোদ্দাম ও আতফাল অংশ গ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ খাদেমুল ইসলাম

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে স্থানীয় ইজতেমা '৯১ ও মাতাপিতা দিবস অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত ১২ই সেপ্টেম্বর '৯১ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার একদিন ব্যাপী ইজতেমা উত্তর আহমদী পাড়াস্থ অস্থায়ী নামায পড়ার স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৩ জন খোদ্দাম ও ৯৯ জন আতফাল অংশ গ্রহণ করে। বাদ মাগরিব স্থানীয় আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে মাতাপিতা দিবস অনুষ্ঠান উদযাপনের পর পরই সমাপনী অধিবেশনে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কাজ সমাপ্ত হয়।

শাহজাদা খাঁন

শুভ বিবাহ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জামাল পুরের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আবদুল নূর চৌধুরী সাহেবের ৪র্থ পুত্র স্থানীয় কায়েদ ডাঃ মোহাম্মদ রফিক আহমদ চৌধুরী সাহেবের সহিত চাঁদপুর চা বাগান জামাতের সেক্রেটারী মোহাম্মদ আবদুল কাদির চৌধুরী সাহেবের ২য় কন্যা মোসাম্মাৎ ফয়জুন্নাহার মিনু বেগম চৌধুরীর শুভ বিবাহ ২৬,১০১/০০ (ছাব্বিশ হাজার একশত এক) টাকা দেন মোহরে গত ৩১শে জানুয়ারী, ৯১ ইং রোজ বৃহস্পতিবার চণ্ডি ছড়া চা বাগানে তাহার বাসভবনে সু-সম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহ পড়ান মোয়াল্লেম এস এম আবদুল হক সাহেব। উক্ত বিবাহ যাতে সার্বিক বরকতময় হয় এবং দম্পতির সুখী সুন্দর জীবনের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট বিশেষভাবে দোয়ার আকুল আবেদন করা যাচ্ছে।

ডাঃ মোহাম্মদ রফিক আহমদ,
জামালপুর

সন্তান লাভ

মাসুমাবাদ (রূপগঞ্জ) নিবাসী জনাব মোসাদ্দেকুর রহমান (ইসহাক) ও নাসিরা বেগম (পান্না) কে আল্লাহ্‌তা'লা গত ৩/৯/৯১ ইং তারিকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন। উক্ত নবজাতক মরহুম দরবেশ আবদুস সালাম সাহেবের নাতনী। আল্লাহ্‌র ফযলে সে 'ওয়াকফে নও' এর

অন্তর্ভুক্ত। তাই জামাতের সকল ভাই বোনদের নিকট তার শারীরিক, দীর্ঘায়ু ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

ফকির মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার

আল্লাহ্‌তা'লা গত ৮-১০-৯১ তারিখ রোজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্র ৯-৩০ মিঃ সময় খাকসারকে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌। নবজাতক ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত (নং ২২২১ বি)। তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু আর খাদেমে দীন হওয়ার জন্য সকল ভাই-বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

আবদুল হাদী, সদর
মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

দোয়ার আবেদন

বাংলাদেশের আহমদী ভাই ও বোনদের নিকট আমার সালাম রহিল। অনেক দিন যাবত আমি খুব বেশী পেরেশানীতে দিন যাপন করিতেছি। আল্লাহ্‌ পাক যেন আমার পেরেশানী দুর করিয়া দেন এবং জামাতের খেদমত করিবার সুযোগ দেন।

আলহাজ্জ আলী আহমদ
নারায়ণগঞ্জ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আমার বড় জামাতা খান মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৮ সনের হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে বি, কম (সম্মান) পরীক্ষায় পটুয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে মেধা তালিকায় সপ্তম স্থান অধিকার করে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার দুনিয়াবী এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান,
অফিস সেক্রেটারী
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

মির্যা হাসান আরিফ মাহ্‌মুদ (শুভ্র), পিতা—জনাব জুলফিকার হায়দার, কিশোরগঞ্জ ১৯৯১ ইং সনের এস, এস, সি পরীক্ষায় দু'টি লেটার সহ প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে (আলহামদুলিল্লাহ্‌)। সে মরহুম মৌলভী আনিসুর রহমান (এডভোকেট) সাহেবের নাতী। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট তার দীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য দোয়ার আবেদন রইলো।

কাওসার আহমদ

শোক সংবাদ

চট্টগ্রাম জামাতের ষোলশহরস্থ হালকা প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক সাহেব গত ১৯/৯/৯১ ইং রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ১-৩০ মিনিটের সময় ৭০ বৎসর বয়সে অনেক আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রাখিয়া ইন্তেকাল করেন। তাঁহার পূর্ব পুরুষ আরব দেশ হইতে আগমন করেন। তাঁহারা সকলেই পীর বংশীয় ছিলেন। তাঁহার পিতা ও মাতার মাজার ভারতে নদীয়া শান্তিপুরে অবস্থিত। আজও প্রতি বৎসর সেখানে ওরশ হয়। তিনি পরবর্তী পর্যায়ে আহমদীয়াতে বয়াত গ্রহণ করেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পৃথিবীর সকল ধরণের লোভ লালসা ত্যাগ করিয়া আহ্‌মদীয়াতের ছায়াতলে অটল ছিলেন। তিনি এই এলাকায় প্রথমে বসতি স্থাপন-কারী। তিনি জামাত এবং এলাকার সকল ব্যক্তির নিকট তাঁহার চারিত্রিক গুণাবলী, সদালাপী, বিনয়ী, নম্র, ন্যায় বিচারক, সুপরামর্শদাতা এবং আহমদীয়াতের প্রচারে একনিষ্ঠতার কারণে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। এই এলাকার যে সকল ব্যক্তি আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া তাহাকে শেষ করিয়া দিবার ষড়যন্ত্রে তাঁহার জায়গা বা সম্পত্তি দখল করিতে সচেষ্ট ছিলেন, তাহাদের সকলের প্রতিরোধের মুখে স্থানীয় আহমদীদের নিয়ে তিনি অটল পাহাড়ের মত অসীম সাহসিকতার সাথে অবিচল ছিলেন। যাহার ফলে তাঁহার জানাযার সময় তাঁহার বাড়ীর প্রাঙ্গণে আহ্‌মদী ছাড়া অনেক গয়ের আহমদী ভাইও জানাযায় শরীক হন। তাঁহার রূহের মাগফেরাত কামনা করার জন্য সকলের নিকট অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোহাম্মদ মনোয়ারুল ইসলাম

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

১৯৮৯ সালে স্বল্প কালের জন্য আমার মস্কো ও লণ্ডন দেখার সুযোগ হয়েছিল। মস্কোর পাশে গ্রাম দেখেছি, দেখেছি লণ্ডনের পাশে গ্রাম। বিরাট তফাৎ। লণ্ডনের জীবন যাত্রা এবং মস্কোর জীবন যাত্রাতেও পার্থক্য সুস্পষ্ট। জিনিসপত্রের এবং খাদ্য দ্রব্যের মানের মধ্যেও আকাশ পাতাল ব্যবধান। মানুষের হাশি খুশীতেও যেন এই উভয় স্থানের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করলাম। প্রবোধ সান্যাল দীর্ঘ দিন থেকে যা দেখেছেন, আমার অল্প দর্শনেই তা সত্য বলে মনে হয়েছে।

হাজার হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ্‌ তাঁর এক নবীকে জানিয়েছিলেন, "হে গোগ, রোশের, মেশকের ও তুবলের অধ্যক্ষ, দেখ আমি তোমার বিপক্ষে (যিহিস্কেল, ৩৮:৩)। আল্লাহ্‌ বলছেন যে, তিনি রোশ বা রাশিয়া, মেশক বা মস্কোর বিপক্ষে। কারণ তারা আল্লাহ্‌কে তার যমীন থেকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। যুগ-ইমামের ভবিষ্যদ্বাণীতে আছে, আবার রাশিয়ায় ইসলাম প্রসার লাভ করবে। হ্যাঁ, রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন আল্লা-হ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করবে। এর জন্য আরো কিছুকাল আমাদেরকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

লক্ষ অমুসলিমের মুখে আহ্‌মদীরা জামা'ত কলেমা তৈয়্যবা তুলে দিয়েছে। তারা ইসলামের ছায়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। সারা বিশ্বের আলেম সমাজ কি পাঁচ লাখ অমুসলিমকেও গত কুড়ি বৎসরে মুসলিম বানিয়েছেন বলে দাবী করতে পারবেন? বিশ্বের পৌণে দু'কোটি আহ্‌মদী মুসলিমকে আইন দ্বারা বা শক্তি প্রয়োগে অমুসলিম না বানিয়ে পৌণে দু'কোটি অমুসলিমকে মুসলিম বানিয়ে দেখিয়ে দিন না। তবেই আমরা ভাবব, আমাদের আলেম সাহেবরা সত্যি মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শে আদর্শবান তারা যতগুলোকে কাফের বানিয়েছেন, অন্ততঃ ততগুলোকেও ইসলামে দীক্ষিত করেছেন।

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও কতিপয় আলেম ও গোষ্ঠী এহেন কাফের বানানোর কার্যকলাপ থেকে বিরত হননি। যার সাধ্যে যতটুকু কুলোয় তিনি সেভাবে মুখের ফুৎকারে আহ্‌মদীদেরকে অমুসলিম বানানোর চেষ্টা করেছেন এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও পেশ করেছেন। সরকারী মদদ লাভের জন্যেও চেষ্টা-প্রচেষ্টার ত্রুটি করছেন না। এসব গুণীজনদের নিকট আমাদের নিবেদন: আপনারা একশ' বছর ধরেইতো এভাবে চেষ্টা করে আসছেন। তাতে কতটুকু ভালমন্দ ফল হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখার উপযুক্ত সময় এখন এসে গেছে। এত চেষ্টা সত্বেও আহ্‌মদী আজ পৃথিবীতে একজন থেকে প্রায় পৌণে দুই কোটিতে পৌঁছেছে আর যে ধ্বনি ভারতীয় উপমহাদেশের এক গণ্ড গ্রাম কাদিয়ান থেকে উত্থিত হয়েছিল তা আজ বিশ্বের ১২৬টি দেশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সুতরাং আপনারা কালক্ষেপ না করে, হুযুর (সাঃ)-এর সুন্নত অবলম্বন করে মানুষকে কাফের না বানিয়ে মুসলমান বানানোর চেষ্টায় ব্রতী হোন, সফলতা লাভ করতে পারবেন। আইন করে যদি কাউকে কাফের বানানো যেত তাহলে আইন করে কাউকে মুসলমান বানিয়ে দেখিয়ে দিন না কেন, অশেষ সওয়াব হবে। কাফের ও মুসলমান এর সংজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত ফরমান দু'টোর উল্লেখ করতে চাই:

(১) "হযরত আবু যোবায়ের (রাঃ) বলেন, 'আমি যাবের ইবনে আবদুল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কবীরাহ্‌ গুণাহকে কি শির্‌ক মনে কর? যাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ উত্তর করিল, না, আমরা শির্‌ক মনে করি না। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি রসূল করীম (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—হুযুর উম্মতে মুহাম্মদীর এমন কোন গুণাহ্‌ আছে কি যাহা করিলে কাফের হইয়া যায়? হুযুর (সাঃ) উত্তা করলেন—'না', আল্লাহর সাথে প্রকাশ্য শির্‌ক করা ব্যতীত কোন গুণাহ এমন নাই, যাহা করিলে কাফো হইতে হয়। (মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানিফা (রাঃ) প্রথম খণ্ড মাওলানা কারামত আলী নিযামী কর্তৃক বঙ্গানুবাদকৃত পুস্তকের ২০-২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(২) "আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের যবহ করা প্রাণীর গোস্ত খায় সে-ই মুসলমান। তার দায়িত্ব লইয়াছেন আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র দায়িত্বের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করিও না—"। (বাংলা একাডেমী কর্তৃক বঙ্গানুবাদকৃত তজ্‌রীদুল বুখারী পুস্তকের ১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আহ্‌মদী

15th October, 1991

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"

অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদকঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan